মিলন।

নয়নের জলে যে হাসিটী ফুটে
নাহিক তাহার লেখা!—
ঘন বরষায় গগনের গায়
উদিত অরুণ রেখা!

দুঃখের মিলন টুটিবার নয়—
জীবনে মরণে গাঁথা;
মান অভিমান নাহিক তথায়,
নাহিক বিরহ-ব্যথা!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

সোণার হার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাহমনী-স্থলতান ফিরোজ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সামন্তগণ ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের সব কথা বলা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং মুদ্কল-অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বিজয়নগরের সেনা সজ্জিত হইল। যখন তুঙ্গভদ্রার বাম-তীরে সামন্তগণ শুনিলেন যে এ-সমস্ত প্রধান-নায়ক বিজয়নগরের চিরন্তন সামরিক প্রথা লুপ্ত করিয়া পদাতিকের উপর নির্ভর করিতেছেন, তখন শিবিরে বিষম কোলাহল উত্থিত হইল। নিশীথে সামরিক সভায় কিছুই স্থির হইল না। দেবরায়, মধুরাও ও মধুরাওয়ের দুই পুত্র আপন আপন শিবিরে যাইবার পথে কথোপকথন করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র নাগরাও বলিলেন, "দাদা! বাবা যদি এ প্রথা প্রচলিত করিয়া যান, আর আমি যদি প্রধান নায়ক হই, তবে এ প্রথা উঠাইয়া দিব।" মধুরাওয়ের স্বর রুক্ষ হইল; তিনি বলিলেন, "উদ্ধত হইও না কিল্লাদার! বর্ত্তমান প্রধান-নায়কের মৃত্যুর পর বা তাহার কার্য্যের যখন প্রয়োজন হইবে না, তখন মহারাজাধিরাজ আপন অভিরুচি অনুসারে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। যোগ্যতর কিল্লাদার নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বর্ত্তমান প্রধান-নায়কের মতে সিরুগুপ্পার কিল্লাদার অপেক্ষা আনিগুণ্ডির কিল্লাদার অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি।" সিরুগুপ্পাদুর্গাধিপতি নাগরাওয়ের প্রফুল্লতা নিমিষে অন্তর্হিত হইল। তম্বুরাও ভ্রাতাকে নিম্নস্বরে ও সস্নেহে বলিলেন, "ভাই! বাবা যাহাই বলুন, আমি জানি, তুমিই যোগ্যতর সেনাপতি। পাংশুমুখে অথচ সহজকণ্ঠে নাগরাও বলিলেন, "না, দাদা! পিতার কথাই ঠিক।" দেবরায় সবই শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে বিচার না হয় আমিই করিতেছি; যে আপন দুর্গ শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবে না তাঁরই বীরত্ব অধিক।" তম্বুরাও ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া পিতার পার্শ্বে আসিলেন এবং দুইজন পিতৃচরণ স্পর্শ

করিয়া শপথ করিলেন যে, তাঁহাদের জীবন থাকিতে শত্রু দুর্গে প্রবেশ করিবে না। শপথ করিয়া দুই ভ্রাতা শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

যাইতে যাইতে মধুরাও দেবরায়কে বলিলেন, "নাগের প্রতি অবিচার হইল। আনিগুণ্ডি রাজধানীর সাহায্য পাইবে, কিন্তু সিরুগুপ্পা সাম্রাজ্যের সীমান্তে। তবে উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই; এরূপ না করিলে যুদ্ধ শিখিবে কি করিয়া?" মধুরাও মুখে যাহাই বলিতেন না কেন, তাঁহার মনে পুত্রদ্বয়ের বীরত্বের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার চরিত্রের কোমলভাব প্রকাশ পাইত দেবরায়ের সহিত ব্যবহারে; কখন কখন কন্যা হেমও সে কোমলতার আস্বাদ লাভ করিত। দেবরায়ের পিতার মৃত্যুর পর দেবরায়ের জননী দেশপ্রথা মত চিতানলে সহমৃতা হ'ন। সেই অবধি তিনি ও তাঁহার গৃহিণী মাতৃহীন বালকের মাতার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর গৃহিণীর মৃত্যু হইল। তখনও দেবরায় প্রবীণ প্রধান-নায়কের জন্য মাতার অভাব জানিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বীয় পুত্রগণের নিকট তাঁহার অন্য মূর্ত্তি প্রকাশিত থাকিত। সে মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য-ভূমির ন্যায় কঠোর। তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যখন দেবরায়ের অগ্রজের রাজত্বকালে বাহ্মনী-সেনার সহিত যুদ্ধে কৃষ্ণাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার বজ্রকঠিন বদনমণ্ডলে কেহ শোকের ক্ষীণমাত্র রেখা অঙ্কিত দেখেন নাই। দেবরায় স্বয়ং মধুরাওয়ের মধ্যমপুত্র তত্তুরাওকে রাজধানীর সমীপস্থ আনিগুণ্ডির দুর্গের কিল্লাদার-পদে নিযুক্ত করেন। মধুরাও আন্তরিক আপত্তি করিয়াছিলেন যে তত্তু বয়সে যুবক ও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু দেবরায় সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। মারাপ্পা সিরুগুপ্পা ত্যাগ করিয়া যখন রাজধানীতে আসিলেন, তখন তাঁহারই পরামর্শ-অনুসারে সে দুর্গের ভার মধুরাওয়ের কনিষ্ঠপুত্র বালক নাগরাওয়ের উপর সমর্পিত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রেও প্রধান-নায়কের মতানুসারে কার্য্য করা হয় নাই। কিন্তু মারাপ্পা ও দেবরায়ের মিলিত ইচ্ছার নিকট তাঁহার অমত গ্রাহ্য হইল না। কালে পুত্রগণ-সম্বন্ধে মধুরাওয়ের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কিছুই বলেন নাই। তবে মুদ্গলে যাইবার পথে যখন তিনি সিরুগুপ্পায় কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নাগরাওয়ের কার্য্যাবলীর মূলে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে প্রশংসা পিতার কণ্ঠোচ্চারিত পুত্রের গুণকীর্ত্তন নহে, তাহা বীরের কীর্ত্তি-দর্শনে বীরের বদন হইতে অতর্কিতে নির্গত উচ্ছ্বাস—গুরের অযাচিত স্থায্য পুরস্কার।

প্রভাতে গুত্তীকোটার সামন্ত প্রস্তাব করিলেন যে, সামন্ত-সৈন্য প্রাচীন প্রথামত পুরোভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করুক, পার্শ্বে রাজকীয় সেনা তাহাদের ইচ্ছা-মত নূতন পদ্ধতি অনুসারে সমরে অবতীর্ণ হউক, নতুবা সামন্ত সেনাকে আদেশ প্রদান করিলে তাহারা অবিলম্বে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে পারে। দেবরায় দূর হইতে বাহ্মনী-শিবির পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা আক্রমণ করিলে ফল হইবে না।" শত্রু শিবির-সম্মুখে সমরোপকরণবাহী শকট-

শ্রেণী লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; আপনাদের অশ্বারোহি-সৈন্য সে শকটশ্রেণী ভেদ করিবার পূর্ব্বেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। এ স্থলে প্রধান-নায়ক হস্তি-সৈন্য নিয়োগ করার সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করেন জানিতে ইচ্ছা করি।” মধুরাও অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হস্তি-সৈন্যের প্রথমে প্রয়োজন নাই ; তাঁহার পদাতিক সেনাই সম্মুখে থাকিয়া আক্রমণ করিবে, সামন্ত সেনা তাহার পার্শ্ব রক্ষা করিবে। যদি যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারিত না হয় হস্তি-সৈন্য অগ্রসর হইবে।

মধুরাওয়ের বিশ্বাস ছিল যে, হস্তি-সৈন্যের সাহায্য না লইয়াই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারিবেন। পাছে হস্তীগুলি শত্রুর বাণাহত হইয়া ফিরিয়া আপন সৈন্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিজয়নগর-বাহিনী সজ্জিত হইবার মত সময় পাইয়াছিল, বাহমনী-বাহিনী তাহা পায় নাই এবং সেইজন্য সুলতান রাজ্যের সমস্ত সৈন্য একত্র করিতে পারেন নাই। সুলতান-ভ্রাতা আহম্মদ্ রায়চূড় রক্ষা করিবার জন্য মাত্র চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মধুরাও রায়চূড় আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার আশা ছিল আহম্মদের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আসিবার পূর্ব্বে তিনি আপনার অর্দ্ধশিক্ষিত অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রথম যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, তারপর একবার রায়চূড় অধিকার করিয়া লইতে পারিলে সেখান হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা শত্রুর পক্ষে অসম্ভব হইবে। কিন্তু মধুরাও একটি কথা ধারণার মধ্যে আনেন নাই ; সেটি সুলতান-ভ্রাতা আহ্মদ ও বাহমনী-সৈন্যের রণকুশলতা। আহ্মদের নির্ব্বাচিত সৈন্য-সমষ্টিতে বাহমনী-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরগণ ছিলেন ; তাঁহার সৈন্য সংখ্যায় অল্প বটে, কিন্তু তাহারা সুশিক্ষিত, বহুযুদ্ধে তাহাদের বীর্য্য পরীক্ষিত হইয়াছিল।

মধুরাও আপন মনের কথা কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। সুতরাং মন্ত্রণা সভায় তিনি আপনার প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র গণ্ডীকোটার বৃদ্ধ সামন্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, “ফলাফল নিষ্পত্তি করিবার জন্য হস্তি-সৈন্যকে অগ্রসর হইতে হইবে না। যখন প্রধান-নায়ক তাঁহার প্রিয় সৈন্যের সহিত প্রথম আক্রমণের পরই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য হস্তি-সৈন্য অগ্রসর হইবে।” বাদানুবাদে মধুরাওয়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, “পদাতিক সৈন্য পলায়ন করিবে না ; কারণ পলায়নের উপায় তাহাদের নাই। যাহারা অশ্ব-পৃষ্ঠে যুদ্ধ করে তাহারা অনায়াসেই সে কার্য্য করিতে পারিবে।” দেবরায় দেখিলেন দুই জনই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে না শান্ত করিলে একটি বিবাদের সৃষ্টি হইবে ; অন্যান্য সামন্তগণের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মুখেও দারুণ অসন্তোষের ভাব। মধুরাও কাহারও প্রতি দৃকপাত না করিয়া তখন বলিতেছিলেন, “মহারাজাধিরাজ ! আমার পদাতিক সেনাকে আক্রমণ করিতে দিন, শত্রু-শকটের শ্রেণী তাহাদিগের গতি-রোধ করিতে পারিবে না।”

দেবরায় মধ্যস্থ হইয়া একটি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্থির হইল, পদাতিক মধ্যে রহিবে, তাহাদিগের বাম পার্শ্ব রক্ষা করিবে সামন্ত-সৈন্য, হস্তি-সৈন্য ও সম্রাটের দেহরক্ষী অশ্বারোহী সেনাদল দক্ষিণ-পার্শ্বে রহিবে। মধুরাও পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তাঁহার পদাতিক-সৈন্য প্রথমে আক্রমণ করিবে; সামন্তগণের আপত্তির ফলে তাঁহারা সকলে আপন আপন সৈন্য লইয়া একযোগে আক্রমণ করিতে পারিবেন, এইরূপ স্থির হইল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবরায় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বার বার চেষ্টা করিয়াও সামন্ত-সৈন্য শকটশ্রেণী ভেদ করিতে পারিল না। শত্রুর নিঃক্ষিপ্ত তীরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাহারা বারংবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল। মধুরাও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আপনার সৈন্যগণের সহিত কুঠারহস্তে কাষ্ঠশকটশ্রেণী ভেদ করিয়া ব্যূহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আহম্মদের অধীন সৈন্যগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সামন্ত-বাহিনী বাম পার্শ্বে না থাকায় একদল অশ্বারোহি-সৈন্য মধুরাওয়ের পদাতিক-সেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিল। সুলতান-পুত্র হাসান সে সৈন্যদলের নেতা। বাণ ও বর্শার সাহায্যে মধুরাও অনেকক্ষণ তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিলেন; সম্মুখে ও পার্শ্বে আক্রান্ত হইয়া মধুরাওয়ের সৈন্য দলে দলে মরিতে লাগিল। মুসলমান সেনার বাম পার্শ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হইলে মধুরাওয়ের বিপদের সীমা থাকিত না।

দেবরায় স্বয়ং হস্তিসৈন্যের নেতা হইয়া বাহমনী-সেনার বামপার্শ্বে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহা ধ্বংস করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক রণমাতঙ্গের দেহাগ্রভাগ লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত, দুইটি দীর্ঘ দন্তের সহিত দুইটি ক্ষুরধার বক্রতরবারি সংলগ্ন; পৃষ্ঠে হাওদায় তরবারি ও অস্ত্রধারী সৈন্য। এইরূপ চারিশত রণহস্তী লইয়া দেবরায়ের পক্ষে শকটশ্রেণী ভেদ করা সহজ হইয়াছিল; বিশেষতঃ আহম্মদ তাঁহার তীরন্দাজ সৈন্য সেখানে রাখেন নাই; যাহারা ছিল তাহারা অশ্বারোহী সৈন্য। তাহারা হস্তিসৈন্যের আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না, ছত্রভঙ্গ হইয়া আহম্মদের পদাতিক বাহিনীর পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইল। মধুরাও এই গোলযোগের মধ্যে আপনার বাহিনীকে সুসংযত করিয়া লইলেন।

সুলতান-ভ্রাতা আহম্মদ বিজয়নগর-সেনাকে বহুক্ষণ এ বিজয়োল্লাস ভোগ করিতে দিলেন না। তাঁহার আদেশে মুসলমান পদাতিক সৈন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং অবিরলধারে হস্তিসৈন্যের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। হস্তীর দল দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিল, চালকের শত চেষ্টা ও অঙ্কুশ প্রহারেও তাহাদের ফিরাইতে পারা গেল না। কেবল রক্তাক্ত-দেহ সৈনাক গৈরিকস্রোতঃ-শোভিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অটলবিক্রমে প্রভুকে বহন করিতেছিল এবং উন্মত্ত ঝঞ্ঝার ন্যায় শত্রু-কণ্টক দলিত করিতেছিল। তঞ্জুরাও ও দেহরক্ষী অশ্বারোহী সেনাদল দেবরায়ের পার্শ্বভাগ ত্যাগ করে নাই। পদাতিকগণের বিপদ্ দেখিয়া আহম্মদ স্বয়ং অবশিষ্ট অশ্বারোহী লইয়া দেবরায়কে আক্রমণ করিলেন।

আহমদ বুঝিয়াছিলেন যে এই আক্রমণের ফলের উপর যুদ্ধের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সংক্ষুব্ধ ধূলিরাশি ও রণগর্জ্জনের মধ্যে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য মৈনাক। ছিন্ন ভিন্ন সেনারাশির ন্যায় শত বাধা উড়াইয়া দিয়া তিনি দেবরায়ের সম্মুখীন হইলেন। দেবরায়ের নিঃক্ষিপ্ত শূল তাঁহার লোহ শিরস্ত্রাণে প্রহত হইল। মৈনাক উত্থিত শুণ্ড অবনমিত করিয়া আহমদের অশ্বের গ্রীবাদেশ ধারণ করিতে যাইতেছিল। আহমদ রেকাবির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিশাল অসির একটিমাত্র আঘাতে মৈনাকের অংশুবর্ম্মরক্ষিত শুণ্ড ছেদন করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত একজন বাহমনী-বীর মৈনাকের বক্ষঃস্থলে তরবারি আমূল প্রোথিত করিয়া দিল। মরণ-আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া রণ-হস্তী বসিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে নিজের দেহভারে বক্ষোনিম্নস্থিত শত্রুর দেহ নিষ্পেষিত করিল। দেবরায় বন্দী হইতেন, কিন্তু তাঁহার শত দেহরক্ষী আপন প্রাণ দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে স্তূপীকৃত শব-রাশির মধ্যে বিনায়ক রাও পিতৃব্যের দেহ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি আক্রমণের সময় বৃদ্ধকে বাণবিদ্ধ অশ্বের সহিত পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। বহু অন্বেষণের পর তিনি পিতৃব্যের আহত দেহ দেখিতে পাইলেন। অনুচরগণ সযত্নে সে দেহ পশ্চাতে লইয়া গেল। তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন, এমন সময় পার্শ্ব হইতে একটি যন্ত্রণাধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে গমন করিয়া দেখিলেন একজন সামন্ত মরণাহত হইয়া ভূতলশায়ী রহিয়াছেন। তিনি গণ্ডী-কোটাধীশ্বর; বিনায়ক রাওকে দেখিয়া বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! নারায়ণকে বলিও সে যেন মন্দির-ত্যাগ করিয়া আবার অস্ত্র ধরে। দুইজন বৃদ্ধ অবশিষ্ট রহিল,—আদোনীর সামন্ত আর প্রধান-নায়ক। তাঁহারা দুইজনে কিছু করিতে পারিবে না। তোমার পিতৃব্যের দেহ পাইয়াছ কি?" বিনায়ক তাঁহাকে জানাইলেন যে পিতৃব্য আহত হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ আরোগ্য-লাভ করিবেন। গণ্ডীকোটাধীশ্বর বলিলেন, "বিরূপাক্ষদেবের অনুগ্রহ! যুবক! সে দেহ হস্তিপৃষ্ঠে স্থানান্তরিত করিও না—অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইবে।" তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন, "মধুরাওকে বলিও তাহার কথাই ঠিক্! তীর সামন্তের মর্য্যাদা রাখিল না। তবে শত্রুর এ চিহ্ন পার্শ্বে লইয়া মরিতে পারি না। তীর বাহির করিয়া লহ।" তীরের মুখাগ্রভাগ বক্র ছিল, বাহির হইতে চাহিল না। বৃদ্ধ বলিলেন, "মুসলমান যুদ্ধ করিতে জানে কি-না দেখিলে?" বিনায়ক রাও বৃদ্ধের পাদ-বন্দনা করিয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এইরূপ মৃত্যু লাভ হয়।" গণ্ডীকোটাধিপ বলিলেন, "দীর্ঘজীবী হও! বীরের পুত্র, বীরের ন্যায় মরিবে। তীর বাহির করিতে পারিলে না? ঢালের পাশে ফলাটি রাখিয়া তরবারি দিয়া কাটিয়া ফেল; তার পর উহা টানিয়া লইয়া আমাকে তুলিয়া ধর।" বিনায়করাও আজ্ঞা পালন করিলেন, বৃদ্ধ বিনায়কের বাহু-মধ্যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মধুরাও তখনও যুদ্ধ করিতেছিলেন। হস্তি-সৈন্যের পলায়ন, মৈনাকের পতন, দেব-রায়কে রক্ষা করিবার জন্য তঙ্গরাওয়ের প্রবল চেষ্টা, সবই তিনি দেখিয়াছিলেন। যখন রণজয়ী আহমদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার

দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলেন, তিনি বুঝিলেন, আর সংগ্রাম বৃথা। নাগরাও ও বিনায়ক সেই মুহূর্ত্তে কয়েক সহস্র সামন্ত অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি তাহাদের লইয়া মুসলমান বাহিনীকে শেষবার আক্রমণ করিলেন এবং সেই অবসরে পদাতিক সেনাকে দূরে অপসৃত হইবার আদেশ দিলেন।

বিজয়নগর-সেনা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আহ্‌মদ্ সুরক্ষিত শিবিরের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা কম; পরাজিত হইয়াও দেবরায়ের সৈন্যসংখ্যা তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী। আপন শিবিরের সন্নিকটে সামন্তবাহিনী আদোনী-রাজের অধীনে সমবেত হইতেছিল। সুতরাং আহ্‌মদ বিজয়লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন; ভাবিলেন পরে উত্তর হইতে নূতন সৈন্য আসিলে বিজয়-নগর-বাহিনীকে ধ্বংস করা কঠিন হইবে না।

(ক্রমশঃ।)

আমাদের খাদ্য।

দুগ্ধ।—দুগ্ধকে সাধারণতঃ নিরামিষ আহার বলা হয়, কিন্তু ইহা জন্তুর শরীর হইতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে Animal food বা আমিষের মধ্যে গণ্য করা হয়। দুগ্ধ একটী সম্পূর্ণ আহার; কারণ, ইহাতে আমাদের শরীর-বৃদ্ধিকারী পুষ্টিকর সকল উপাদানই বর্ত্তমান।

গোদুগ্ধের উপাদান-মধ্যে ছানাই প্রধান অম্লজান-(Nitrogenous) পদার্থ। দুগ্ধের চিনি-জাতীয় ভাগকে Milk Sugar বলে। ইহা সাধারণ চিনির ভিন্ন আকৃতি। ইহাতে মিষ্টতা খুবই কম এবং সাধারণ চিনির ন্যায় শীঘ্র গাঁজিয়া যায় না। কিন্তু ইহা শীঘ্রই জীবাণুর ক্রিয়ার দ্বারা পচনশীল হইয়া ল্যাক্টিক্ এসিড উৎপন্ন করে। দুগ্ধের অম্ল আস্বাদনের ইহাই প্রধান কারণ। দুগ্ধের তৈলীয়ভাগ মিশ্রিতভাবে দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকে এবং গরম করিলে উপরে ভাসিয়া সরে পরিণত হয়। দুগ্ধের প্রধান খনিজ উপাদান ফস্‌ফেট্ অব্ পটাস্ ও ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম্। ফস্‌ফেট্ অব্ পটাশের পেশীনির্ম্মাণকারিতা গুণ এবং ফস্‌ফেট্ অব্ লাইমের গুণ অস্থি-নির্ম্মাণকারিতা। দুগ্ধের শতকরা ৮০ ভাগ জলীয়।

দুগ্ধ গলাধঃকরণ হইবামাত্রই গাঢ় পদার্থে পরিণত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইতে অনেক বিলম্ব হয়। দুগ্ধের সহিত চূণের জল কিংবা বার্লির জল মিশাইলে এই গাঢ়ভাব কতক পরিমাণে কমান যায়। ছোট ছেলেদের দুধ তোলা নিবারণের জন্য তাহাদিগকে অনেক সময় উপরিউক্ত ভাবে মিশ্রিত দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা সহজে হজম হয় কিন্তু দুগ্ধের সহিত Soda water মিশাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে। মাখম-তোলা দুগ্ধের সহজে পরিপাক হয় এবং গরম করা দুগ্ধ অপেক্ষা কাঁচা দুগ্ধ আরো সহজে পরিপাক হয়।

উপরিউক্ত দুগ্ধের গাঢ়ভাব-ধারণ ও দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত করণ, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। একটীতে ছানা গাঁজিয়া বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়, অপরটী সম্পূর্ণ ছানা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে।

দুগ্ধের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান যদিও পৃথগ্‌ভাবে শরীর-বৃদ্ধির জন্য শরীরে শোষিত হয়, কিন্তু তথাপি দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্যের সহিত মিশ্রিত না করিয়া খাইলে, ইহার উপাদান-সমূহ শরীরে শোষিত হয় না। পূর্ণবয়স্কদিগের অপেক্ষা শিশুদিগের শরীরে দুগ্ধ অধিক-পরিমাণে শোষিত হয়। এক সের দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা-শক্তি আধ-সের মাংসের সমান। আধ সের ঘোল দুই আউন্স অথবা ৪ তোলা রুটীর সমান।

মাখম।—সকল প্রকার তৈলীয় পদার্থের মধ্যে মাখম সর্ব্বাপেক্ষা সহজে পরিপাক হয়, বিশেষতঃ যখন ইহা গলান না হয়।

আজকাল মাখমের পরিবর্ত্তে অনেক প্রকার মাখম-জাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয় ;—যথা ড্রিপিং, মার্কারিন, নাট্‌ বাটার, কোকো বাটার ইত্যাদি। Jam, marmalade প্রভৃতিও মাখমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পনির অথবা ছানা।—আমরা যে-ভাবে দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত করি, পনিরও সেইভাবে প্রস্তুত হইলেও তাহার ব্যবহার-বিধি ভিন্নপ্রকারের। আমরা ছানা প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে জলীয়ভাগ সামান্যরূপে নিষ্কাসিত করি ও নরম অবস্থাতেই তাহা ব্যবহার করি। কিন্তু পনির প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে এই ছানা খুব চাপের মধ্যে রক্ষিত হয় এবং যখন জলীয় অংশ শতকরা ৭০ ভাগ নিষ্কাসিত হয়, তখন সেই ছানা ২।৩ মাস কাল কাপড়ের বাঁধিয়া রাখা হয়। তৎপরে ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত পনীর এত পুষ্টিকর যে, ৫ সের দুগ্ধে যত ছানা ও মাখম থাকে, অর্দ্ধ সের পনিরে সেই পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে এবং ইহার পুষ্টিকারিতা-ক্ষমতা সম-পরিমাণ মাংসের দ্বিগুণ ও ইহার শক্তিসঞ্চার-ক্ষমতা তিনগুণ। ইহা আহারে সম্পূর্ণভাবে শরীর-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

উপদেশের ঝুড়ি।

গোয়ালা-বাড়ী হ'তে দুধ এলে ভাল ক'রে জ্বাল দিয়ে খাওয়া বা খাওয়ান উচিত। লালকালী ও সাদা দুধ এ দুটোর যতই জল দেওয়া যায় একেবারে রংটা নষ্ট হয় না। বড় দুঃখে কান্ত কবি বলেছেন—

"ধর্ম্ম আর ক'দিন টেঁকে ?
গোয়ালা মনের সুখে
জল ঢেলে দুধ করেন ঘোল,
করে নিত্য ভগবানের কিরে
(আবার) আদায় করে সুদে আসল
হিসেব করে।"

এ-হেন গোয়ালা দুধে কি জল দেয় তা'র ঠিক নেই। সে যে বিশুদ্ধ ডাক্তারী জল দেয় না, এ নিশ্চয়। এরূপ জল-মেশান দুধ বেশ করে ফুটিয়ে নিলে দোষ থাকে না। জ্বাল দেওয়া দুধও অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ব্যবহার করতে নেই ; কারণ, দুধে শীঘ্র রোগের বীজাণু বেড়ে উঠে।

দুধ জ্বাল দিয়ে যে-পাত্রে উঠিয়ে রাখা হবে অনেক সময়ে তা'তে এক হাতা গরম দুধ দিয়ে একবার নাড়িয়ে নেওয়া হয়। এটা মন্দ

অভ্যাস নয়। কারণ, এতে পাত্রটির দোষ কেটে যায়। তবে তা'তে যখন গরম দুধ ঢালা হবে, তখন এটার তত দরকার হয় না। যাই হোক্ অতিরিক্ত সাবধানে ক্ষতি কি ?

দুধে সামান্য চিনি বা মিছরী দিয়ে খেলে বা একটু আলুসিদ্ধ গুলে খেলে দুধ্ শিগ্‌গির হজম হয়। যে-সব কচি ছেলে দুধ তোলে, তাদের দুধের সঙ্গে এক আধ ফোঁটা পরিষ্কার চূর্ণের জল মিশিয়ে দিলে বা দুধ-খাওয়ানর পরে এক ঝিনুক খাবার জল দিলে দুধ-তোলার ভয় থাকে না। তবে চিৎকার করে কাদ্‌ছে, এমন ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে, তা'র হাত-পা চেপে ধরে, জোর করে তা'র মাথা নীচু করে দিয়ে দুধ খাওয়ালে সে-দুধ সে তুল্‌বেই তুল্‌বে। আর খাওয়ানর সময় বা পরে তা'রে আদর করে আচ্ছা-রকম দোল দিলে দুধ হজম হয় না। আমরা যদি খাওয়ার পর একটা নাগর-দোলায় উঠে দস্তর মত দোল্ খাই, আমাদের নিজেদের কি অবস্থা হয়, তা' বোধ হয় বল্‌তে হ'বে না।

যে দিন ছেলেপিলে বা বাড়ীর লোক মাছ-মাংস বেশী খায়, সে দিন তাদের দুধ না দেওয়াই ভাল। আর দুধ ক্ষীর করে জ্বাল দিয়ে খাওয়ার চেয়ে বল্‌কা জ্বাল-দেওয়া দুধ বেশী উপকারী। ক্ষীর খেতে ভাল বটে, কিন্তু হজম হ'তে বড় দেরী লাগে। আরও এক কথা —এমন একটা উপকারী জিনিশ দুধে আছে যা' দুধ বেশী জ্বাল দিলে উড়ে যায়।

ছোট ছেলেমেয়ের জন্যে দুধই সকলের চেয়ে ভাল খাবার। গাইয়ের দুধ ও মায়ের দুধ, এই দুটি আমাদের দেশে ছেলেপিলের খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়। বাজারে টিনে ক'রে বা শিশিতে করে যে গুঁড়া দুধ বিক্রি হয় তা খেলে ছেলেপিলে তেমন বল পায় না। অনেক সময় ভাল দুধ না পেয়ে ছেলেপিলের হাড় বাড়ে না ; পা-গুলি বেঁকা সরু সরু হয়।

মায়ের দুধ খাওয়ার সম্বন্ধে দু'এক কথা বল্‌বার আছে। আমাদের দেশে ছেলেরা অনেক বড় হয়েও মায়ের দুধ ছাড়ে না। এতে মা'র শরীর খারাপ হ'বার কথা। কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় মা'র উচিত মায়ের বোঁট জলে ধুয়ে নেওয়া। ছেলে যা' মুখে দেবে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। দুধ খাওয়ান শেষ হ'লে মায়ের বোঁট্ আবার ধুয়ে রাখা উচিত ; কারণ, তাতে যে দুধ লেগে থাকে তা' পচে উঠ্‌তে পারে, বা বাতাসের ধুলোর সঙ্গে মিশে অপরিষ্কার হ'তে পারে।

ছোট ছোট ছেলেপিলেকে যখন তখন খাবার জিনিশ দিতে নেই। এমন কতকগুলি বাঁধা-সময় করে রাখ্‌তে হয়, যখন তা'রা খাবার পাবে। অন্য সময় মাথা কোটাকুটি করে লুটো-পুটি খেলেও কিছুতে খাবার পাবে না। খাবার দেবার আগে তাদের হাত-মুখ ধুইয়ে দিতে হয়। ময়লা হাতে খাবার খেলে ময়লাটা পেটে চলে যায়, আর রোগের সৃষ্টি করে। ছেলেদের স্বভাব, তাদের হাত-মুখ থেকে খাবার মাটিতে পড়্‌লে সেই ধুলো-মাখা জিনিশ তুলে আবার তারা মুখে দেয়। একটা বাঁধা-সময় করে তাদের খেতে দিলে তারা এক জায়গায় বসে যাতে খায়, সে ব্যবস্থা করা সহজ। এতে ফল হয়, মাটিতে-পড়া অপরিষ্কার জিনিশ তা'দের খেতে হয় না ; আর তা'রাও বুঝ্‌তে পারে, এই সময়টা তা'দের খাবার সময়—অন্য সময় হাজার চাইলেও কিছু পাবে না।

অনেকে নিজেরা খাবার সময় ছেলেদের কাছে দেখে একটা অন্ধ মায়া করে, তাদের খানিকটা খাবার দেন। এতে তাদের বড় খারাপ অভ্যাস হয়। বাড়ীতে কোন ভদ্র-লোক এসে যখন খাবার খেতে বসেন, ছোট ছেলে গিয়ে তাঁর কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়। এতে ছেলের দোষ কিছুই নেই। যে সমস্ত বাড়ীর লোক খাবার সময় তা'র হাতে খাবার তুলে দিয়ে তা'র স্বভাব বিগ্‌ড়ে দিয়েছেন, তাঁরাই এর জন্য দোষী। যে ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি এই দোষে দোষী না হ'লে হয় ত ভাব্‌বেন, এরা নিজেরাই সব খেয়ে বসে থাকে, বাড়ীর কচি ছেলে-পিলেদের না খেতে দিয়ে শুকিয়ে রাখে।

ছোট ছোট ছেলেপিলেদের চুমা খাওয়া ও তাদের মুখে আপনার চিবান পান দেওয়া বড় খারাপ। কা'র শরীরে কি রোগ আছে সে তা' নিজেই জানে না। যা'দের কোন দোষ নেই, যা'দের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি বুঝ্‌বার ক্ষমতা নেই, যাদের দেখ্‌লে চোখ্‌ জুড়োয়, তাদের ওপর রোগের বোঝা চাপানর কি দরকার আছে, বুঝা যায় না। একটা চুমা না খেলে আদর দেখান হবে না, এমন কথা আদব-শাস্তরের কোথাও লেখা নাই। এঁটো না খাওয়ালে ভালবাসা দেখান যায় না, এ কোন্‌ দেশী কথা! যদি আদর দেখাবার ইচ্ছে হয়, তবে খোকা বা খুকীকে চুমা না খেয়ে, তাদের কাঁধে করে খোলা-বাতাসে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে দেখা যাবে, তা'দের মুখে হাসি ফুটে ওঠে কি না। আর দোকান হ'তে একটা আস্ত সন্দেশ বা রসগোল্লা কিনে খোকা-খুকীর নিজ খাবার সময় তাদের দিলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে তা'রা রাগ ক'রে তা' ফেলে দেয়, না, হাসি মুখে তা' শেষ করে। যা'দের খাবার জন্য, তাদের মুখে হাসি দেখ্‌বার জন্য এমন করতে হ'বে যাতে তাদের বিপদ্‌ হয়?

ছেলেপিলেকে বেশী খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে নেই। অসুখায় খেলে অপকার হয়। অনেক সময় মেয়েরা বলেন, 'একটা চাক্‌না দিয়ে ভাত-ক'টা খেয়ে ফেল্‌, পেটে গেলেই উপকার হবে।' কিন্তু পেটে বেশী গেলে হজম হয় না, এটা যেন মনে থাকে।

খাওয়ার পর ছেলে-পিলের হাত-মুখ বেশ করে ধুয়ে দিতে হয়। ছেলে-পিলে একটু বড় হ'লে তাদের দাঁত ভাল করে পরিষ্কার করে না দিলে দাঁতের ফাঁকে খাবা-রের টুক্‌রা থেকে পচ্‌তে আরম্ভ করে ও সেই সঙ্গে এমন একটা জিনিশ তার মধ্যে জন্মায়, যাতে দাঁতকে খুব দুর্ব্বল করে দেয়। এর ফল হয় এই যে, ছেলে সারা জন্ম দাঁতের গোড়ায় ব্যথা নিয়ে ভোগে। দাঁত খারাপ হ'লে ভাল হজম হয় না; কারণ, চিবাতে না পার্‌লে খাবার জিনিশ লালার সঙ্গে ভাল করে মিশ্‌তে পায় না। দুধ, ভাত, মিষ্টি ও রুটি খাওয়ার পর লেবু, বেদানা, আপেল, ন্যাশপাতি, জাম, জামরুল্‌ ধরণের ফল খেলে দাঁত অনেকটা আপনা আপনিই পরিষ্কার হয়ে যায়। এরূপ ফলমূল খেলে দাঁতেরও উপকার আর হজমও ভাল হয়।

বাজারে চলিত সস্তা দাঁতের মাজন সব সময় ভাল হয় না। বাড়ীতে চক্‌-খড়ি বা তামাকের পোড়া গুল খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে

নিলে বেশ মাজন তৈরী হয়। যা'রা নিম বা কচার দাঁতন করতে পারে তাদের সেইরূপ করাই ভাল। নিমের মত উপকারী গাছ খুব কমই আছে, আর কচা-ভেরান্দার আঠা দাঁতের পক্ষে ভাল। মধুতে কয়লা ঘষে, তাই দিয়ে দাঁত মাজ্‌লে না-কি দাঁত মুক্তোর মত ধব্‌ধবে সাদা হয়। দাঁতের বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। ছেলে-পিলেদের দাঁত আছে, তাদের বাপ-মা আর কোন কোন ভাগ্যিমান্ ঠাকুর্দা, ঠাকুমারও দাঁত থাকে। সকলে মিলে চেষ্টা করলে বাড়ী হ'তে দাঁতের ব্যথাকে নির্কাসনে পাঠাতে পারা যায়। সুবিধা বুঝে দাঁতন বা মাজন ব্যবহার করা যেতে পারে। যাঁদের প্রবৃত্তি হয়, তাঁরা খুব নরম 'বুরুস্' ব্যবহার করতে পারেন্। 'বুরুস'টা একটু ভাল রকম দেখে শুনে কিনতে হয়। যা' তা 'বুরুস' দাঁতে দিতে নেই। যার উপর জীবন-মরণ নির্ভর করে এমন জিনিশ্ পয়সার মায়া করে কিনতে নেই। সস্তা খুজ্‌তে গেলে আমাদের সেই বনিয়াদী 'দাঁতন' ই ভাল। কল্‌কাতার মত যায়গা, যেখানে মাটি সোণা-রূপো ভামার দামে বিক্রি হ'চ্ছে, সেখানেও দাঁতন বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়। ডাক্তারী ওষুধ যেখানে বিক্রী-হয় বা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে ভাল বুরুষের সন্ধান মিলতে পারে।

দাঁতের সম্বন্ধে শেষ কথা, শোবার আগে একবার দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। অনেকে পাণ চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়েন।—এ রকম বেশী দিন করলে এমন সময় আসবে, যখন পাণ চিবাবার আর ক্ষমতা থাকবে না, সখ মেটাবার জন্য ছেঁচা পাণ খেতে হ'বে। এটা সকলেই জানেন্ যে ছেঁচা পাণ, হামান দিস্তের গুঁড়ো চালভাজা, মটরভাজা খাওয়াও যা ছধের অভাবে খোঁপ বা চাল-পিটুলী-গোলা খাওয়াও তাই।

আমাদের দেশে দশ্‌টার স্কুল আফিস্। সে সময় তাড়াতাড়ি করে খেয়ে, না জিরেণ নিয়ে ছোটা শরীরের পক্ষে বড়ই অপকারী। ছেলেরা বা কর্ত্তা যাতে তাড়াতাড়ি করে নাকে মুখে গুঁজে গলার বোতাম দিতে দিতে না দৌড়ান, তা'র ব্যবস্থা করা উচিত। খাবার চিবিয়ে খেলে মুখের লালার সঙ্গে মিশ্‌তে পায় ও শীগ্‌গির হজম হয়। কোনখান থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খাওয়া বা খেয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে যাওয়া অজীর্ণ হ'বার একটা কারণ।

এই সব কথা যে কেহ জানেন না তা' নয়। ছেলে বয়সে একটা শোলোক্ শুনতাম—লক্ষ্মী ও নারায়ণ বৈকুণ্ঠে ব'সে কথাবার্ত্তা করছেন—

> বৈকুণ্ঠেতে বসে আছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ
> কৌতুকেতে ক'ন লক্ষ্মীকে নারায়ণ,
> "কোন্ কোন্ দোষে লক্ষ্মি! কোন্ ঘর ছাড়?"

লক্ষ্মী উত্তর দিলেন—

> "অতিথ্ দুয়োরে গেলে কটুবাক্য কয়,
> বিনা দোষে যে বা স্ত্রীকে ভৎ সায়,
> এঁস্থনি কেন্দুনি * যেবা দুয়োরেতে ফেলে,
> গো-স্থানে ভাত যেবা মুখেতে তোলে,
> সেই অপরাধে আমি ছাড়ি তার ঘর—।"

গরুর মত ভাত-ডাল না চিবিয়ে খেলে হজম্ হয় না, অসুখ করে। গরুয় ও-রকম করে খাওয়া শোভা পায়; কারণ, সেগুলোকে আবার তুলে চিবাবার ক্ষমতা তার আছে। মানুষের যখন সে ক্ষমতা নেই, তাকে মানুষের মত ধীরে সুস্থে খেতে হ'বে।

---

* আঁস্ মাছ ধোয়া জল বা চাল-ধোয়া জল।

রান্নাঘরের সম্মুখে মাছ-ধোয়া চাল-ধোয়া জল, আম-কাঠাল তরী-তরকারীর খোসা, ভাতের ফেন ফেললে তাতে মাছি জন্মাবে। খাবার জিনিশে যাতে মাছি না বসে তার জন্ত সাবধান হ'তে হ'বে। রাঁধা তরকারী ঢেকে রাখা যায়। ছেলে পিলে খেতে বস্‌লে অনেকে ভাতের উপর সামান্ত তেলের হাত বুলিয়ে দেন্। মাছি দেখ্‌তে ছোট হলেও মানুষের পরম শত্রু। মাছি যত পচা দুর্গন্ধ খারাপ জিনিশে-বসে, আবার উড়ে এসে খাবার জিনিশে বসে। মাছি-বসা জিনিশ ছেলেপিলে বা আর কাউকে খেতে দিতে নেই।

অনেক সময় রঙীন জামা, রঙীন্ খেল্‌না, রঙীন্ খাবার ছেলেপিলেকে কিনে দেওয়া হয়। অনেক রঙে বিষ-ধরণের জিনিশ থাকে সে রকম কিছু ব্যবহার করলে তাদের অনিষ্ট হতে পারে। যে সব রং পাকা নয় সেগুলো বেশী খারাপ। বাজারের সস্তা রঙীন্ ল্যাবেনচুস্ * খাওয়ার চেয়ে সাদা মিছরীর দানা অনেক গুণে ভাল। হোলি বা দোলের সময় অনেকে চোখে-মুখে নীল আবির, [illegible] বা অন্ত রং দেয়। ইহা ভাল নয়। কারণ যা' তা' রংয়ে অনেক বিষাক্ত জিনিষ থাকতে পারে। তাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে।

ছেলে-পিলের পোষাক নরম ও ঢিলে হওয়া উচিত। তাদের গা খুব নরম ; শক্ত খস্‌খসে, কুটকুটে পোষাক গায়ে থাকলে তাদের বড় অস্বস্তি হয়। তারা ছটফটে, হেসে খেলে নেচে কুঁদে বাড়ী তোলপাড় করে বেড়াবে।—এই রকম করেই তারা হাত-পা সব চালনা করতে শেখে। তাদের আঁটা পোষাকের বজ্জর-বাধন নাগপাশে বেঁধে দিলে কি চলে ? আঁটা পোষাক গায়ে থাকলে রক্ত চলাচলেরও অনেক ব্যাঘাত হয়।

শীতকালে তাদের গায়ে অনেক রকম পোষাক থাকে। সেইজন্ত তাদের সব সময় চোকে চোকে রাখা যায় না। প্রদীপ এমন যায়গায় রাখ্‌তে হয়, যাতে তারা না ছুঁতে পারে। ঘরে 'হেরিকেন্ ল্যাম্প' থাকলে অনেক ভয় কেটে যায়।

ছেলে-পিলে বাড়ী থাক্‌লে তবে বাড়ী মানায়। তা'রা দেখ্‌তে ফুলের মত সুন্দর, তাদে মন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ। এমন ছোট ছোট ছেলেদের মারা উচিত নয়। অনেকে পরের ওপর রাগ করে নিজের ছেলেকে ঠেঙ্গান। নিজের ছেলেপিলের দিকে তাকালে ত' রাগ পড়ে যাবার কথা। তা'রা যে দোষ-ঘাট করে, তা' ইচ্ছে করে বা নষ্টামি করে নয়। অনেক সময় তা'রা জিনিষ-পত্তর ভেঙ্গে চুরে, ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে। তার কারণ, তাদের কুতূহলটা বড় বেশী। কোন্ জিনিশের মধ্যে কি আছে, কেমন করে সেটি হল, এ জান্‌বার জন্ত তাদের প্রাণ অস্থির। তাই তারা জিনিষটি নষ্ট করে। নষ্ট হবার পর যখন তা' আর গড়্‌তে পারে না, তখন তা'রা কাঁদে। যদি তা'রা দুষ্টামি ক'রে নষ্ট কর্‌ত তা' হলে আর কাঁদত না। অনেক জিনিশ তাদের নাগালের বাইরে রাখ্‌লে রক্ষা পায়। যে সমস্ত জিনিশ খেলনা বলে তাদের দেওয়া হয়, সে ত জেনে শুনেই দেওয়া হয় যে, তা শীগ্‌গির যাবে। কাঠের বা রবারের এমন অনেক খেল্‌না আছে, যা সহজে ভাঙ্গে না।

---

* লজেঞ্জেস্।

অনেক সময় তারা অসাবধানী বলে জিনিশ ভাঙ্গে। এ-অবস্থায় তাদের যা দুঃখ হয়, তাই যথেষ্ট শাস্তি, মেয়ে আর বেশী দুঃখ-শাস্তি দেওয়া যায় না। কবি কালিদাস রায় যে "ভাঙা চুড়ি" বলে কবিতা লিখেছেন তা' পড়লে আমাদেরই দুঃখ হয়। বাপের দেওয়া রাঙা চুড়ি পরে খুকী পুজো দেখ্‌তে গিয়েছে।—

'সানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধুলায়;
আঘাতে কাঁচের চুড়ি একবারে হল গুঁড়ি,
চেয়ে দেখে, একি হায় হায়!
উঠিবে না ধুলা ঝাড়ি, ফিরিবে না আর বাড়ী,
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া;
ভাঙ্গা চুড়ি বার বার, জোড়া দেয় কাঁদে আর,
চুল ছিঁড়ে লুটিয়া লুটিয়া।

বাবা কত বুঝালেন, আবার কিনে দেবেন্ বল্লেন্, খুকী কিন্তু শান্ত না হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।—

'সমগ্র বালিকা-প্রাণ চুড়ি সনে খান্ খান্!
দাম দিবে কেবা বল তার!
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে,
তার যে গো সকলি আঁধার!'

অনেক সময় ছেলেরা মার খায় বাড়ীর লোকের দোষে। তাদের ঠিক্ পথে চালালে তারা অন্য দিকে যাবে না। বাড়ীর লোকে যা করেন্, তা'রা তাই শিখে, আর এ-জন্যে তাদের কাছে শাস্তি পায়। মা সুর্ত্তি-জরদা খান্, ছোট্ট মেয়ে একদিন কৌটা খুলে খানিক্‌টা খেয়ে বমি করতে লাগ্‌ল। বাবার হুঁকোয় এক টান্ দিয়ে ছেলের মাথা ঘুরে গেল। দাদা-ম'শায় আদর করে যে গাল দিলেন, ছেলে হয়্‌বলা পাখীর মত তাই আর এক জনকে বল্‌ল। এতে ছেলেপিলের দোষ কি? তা'রা ত' বোঝে না যে, যারা বড় তাদের সাত খুন মাপ্। তারা যেমন বাবার জুতো পায়ে দিয়ে, দাদার ছাতি নিয়ে, দাদা-ম'শয়ের চস্‌মা নাকে দিয়ে চলে, তাদের কথা-বার্ত্তা-কাজেতেও তারা সেই রকম নকল করে। বাড়ীতে পাওনাদার এলে, বাটীর কর্ত্তা হয়ত বল্লেন্, "বল্ গে, তিনি বাড়ী নেই।" এতে সেই ছেলে যদি মিথ্যা বল্‌তে শেখে তাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত? অবশ্য সকল বাড়ীতে এরূপ ঘটে না; যেখানে ঘটে তারই কথা বলা যাচ্ছে।

ছেলেদের শিক্ষা ঠিক্ রকম দিতে না পার্‌লে, তারাই কখন কখন এক-রকম শাস্তি দেয়। পরের নিন্দা করা উচিত নয়, এ কথা অনেক সাধু লোক বলে গিয়েছেন্। সাধু লোকের কথা যদি সবাই শুন্‌ত, তা হলে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেত। যাঁদের স্বভাব পরের নিন্দে করা, তাঁরা কারুর নিন্দে না করে মুখে জল দেবেন না। তাঁদের কাছে অনুরোধ যেন ছোট ছেলে-পিলের কাছে কারো নিন্দে না করেন। যাঁর নিন্দে করা হ'ল, ছেলে ঠিক্ একদিন তাঁকে বল্‌বে—"সইমা! তুমি খাবার সময় অত বড় হা কর কেন? মা বলছিল, এতে তোমাকে ভারি বিশ্রী দেখায়।" ছেলের সুমুখে নিন্দে করে তাদের বল্‌তে বারণ করে দিলেও তাদের মনে থাকে না। এরূপ বারণ করা পাপ; আর ছেলেদের মনেও এতে একটা পাপের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বারণ করলেও তারা তা' মনে রাখতে পারে না। লাটিম্ মার্ব্বেল ঘুড়ি নিয়ে তাদের কারবার। পৃথিবীর এই বাস্তবিকই ছোট কাজ বা কথার ভেতর তা'রা নেই।

ছেলেদের ভয় দেখাতে নেই। ছোট বয়স থেকে ঝোপ, অন্ধকার, বাঁশ-বাগান, সন্ধেবেলা, তেতালার ছাদ্ প্রভৃতিকে ভয় কর্‌তে শিখে তাদের জন্মটা বৃথা হয়ে যায়। অনেক সময় এরূপ ভয় দেখানর সাঙ্ঘাতিক ফল হয়। শুনতে পাই এক মা দুষ্ট ছেলেকে শান্ত কর্‌তে না পেরে, তাকে এক অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "এই জুজুর হাতে তোরে দিলাম্।" ঘরের ভেতর ছেলের বাবা ছিলেন। ছেলেকে তাঁরই হাতে দেওয়া হ'ল। আগে থেকেই সে ছেলেকে অন্ধকার ও জুজুর সম্বন্ধে ব'লে তার মনে একটা অজানা ভয়ের সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল। বাপের হাতে দিতেই ছেলে আঁৎকে চিৎকার করে উঠ্‌ল, আর সেই সঙ্গে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

সাহেবদের ছেলেপিলেকে এ-রকম ভয়ের কথা শুনতে হয় না। তা'রা যেখানে সেখানে বীরের মত চলে যায়। একটি সাহেবের ছেলের কথা পড়া যায়, তিনি পরে খুব বীর হয়ে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। ছেলেবয়সে তিনি একবার সারা দিন অনেক দূরে এক নদীর ধারে গিয়ে বসেছিলেন। তার ঠাকুমা তাঁরে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পেলেন ও বল্লেন "বাছা! এখানে এতক্ষণ বসে রয়েছ, তোমার প্রাণে কি ভয় নেই?" নাতি বল্লেন, "ভয়? ঠাকুমা! ভয় কা'কে বলে আমি ত' কখনো জানি নে।" তাঁর প্রাণে যে ভয় বলে জিনিশ ছিল না, তা' তাঁর জীবনের কথা পড়্‌লে বেশ বুঝা যায়।

অনেকে বল্‌তে পারেন "ছেলেপিলে ভারী দুষ্টু! কা'রও কথা শোনে না।" একটু চেষ্টা কর্‌লেই সেটা ভাল করা যায়। ছেলেদের কখনো বল্‌তে নাই, "এটা করিস্ নে। এটা কর্‌লে হাড় গুঁড়ো করে দেব।" তারা যেন কখনো না জান্‌তে পারে যে 'না করা' বলে একটা কিছু আছে। সকল সময় তাদের বল্‌তে হবে, "এটা কর"—যেন 'করা' ছাড়া আর অন্য কিছু নেই। 'হাড় গুঁড়ো করা'র ভয়টা ত' কিছুই নয়। বাস্তবিকই ত' তাদের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় না; আর গুঁড়িয়ে দেওয়াও কোন ক্রমেই উচিত নয়। ছেলেপিলেরা শীগ্‌গিরই জানতে পারে যে ও কথাটা 'মুণ্ড-মালার ভ্রূকুটী।' মা-কালীর হাতে যে অসুরের মুণ্ড থাকে তা'র দাঁত-খামাটি ও চোক রাঙানি দেখে যেমন কেউই ভয় পায় না, তেমনি ও কথারও ছেলেদের ভয় হয় না, কারণ তারা বুঝ্‌তে পারে যে কথামত কাজ হ'তে পারে না। তাই বলে যেন কেউ কথা-ঠিক রাখ্‌বার জন্যে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরের মত ছেলেকে বেদম্ না মারেন। তা'হলে তাঁ'কে সব রকম শাস্তি পেতে হ'বে। ওরূপ কথা মুখে আনা পাপ, ও-রূপ কথা মত কাজ করাও পাপ।

ঘুমাইবার কথা।—ডাক্তারি মতে মাথার নীচে হাত রেখে ঘুমালে চোখ বসে যায় ও মুখ চ্যাপ্টা হয়, কুণ্ডলী হ'লে শু'লে শরীর বেঁকে যায়; বেশী উচু বালিশে শু'লে নাক ডাকে; বাম দিক চেপে শু'লে হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়ে, চিৎ হ'য়ে শু'লে শ্বাসের অসুবিধা হয়, নাক ডাকে ও বুকে চাপ বোধ হয়। ডানদিকে কাৎ হ'য়ে ঘুমানই সকলের চেয়ে ভাল।

সরস্বতী।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে সরস্বতীর নাম বেদে পাওয়া যায় এবং সেই স্থানে তিনি বাগ্দেবী ও নদী উভয়-রূপেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহার আধুনিক মূর্ত্তি যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি এবং তাহার যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে তাহাও সেইস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সরস্বতীর সম্বন্ধে পুরাণে যাহা কিছু লিখিত আছে এবং বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগের বাগ্‌দেবতার বিষয় যাহা পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সরস্বতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বীণাপুস্তক-হস্তা শুক্লবর্ণা এক দেবী আবির্ভূতা হ'ন। সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি। রাধা, লক্ষ্মী, দুর্গা, সাবিত্রী ও সরস্বতী সৃষ্টি-কার্য্যে এই পাঁচটি প্রকৃতি। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী তিনিই প্রকৃতি সরস্বতী। তিনি পুস্তক-রচয়িত্রী ও সঙ্গীত, তানমান প্রভৃতির কারণ-স্বরূপা দেবী। তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা ও তিনি বীণা-পুস্তক-ধারিণী, তাঁহার বর্ণ শ্বেতপদ্ম-সন্নিভ।

ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে সরস্বতীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ ষোড়শ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাহার পর অন্যান্য দেবগণ এবং মানবগণ সরস্বতীর পূজা করিলেন। গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যোপদেশে সরস্বতীর উপাসনা করিয়া নষ্টজ্ঞান পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার গুরুর কলহের কথার উল্লেখ করিয়া কেবলমাত্র সূর্য্যের স্তবদ্বারা শুক্লযজুর্ব্বেদ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সূর্য্যের সহিত সরস্বতীর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সরস্বতীর মাহাত্ম্য বাড়িল।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সরস্বতী বিষ্ণুর ভার্য্যা হ'ন। বিষ্ণুর অন্য দুই পত্নীর নাম লক্ষ্মী ও গঙ্গা। একদিন কলহ করার ফলে গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন, তিনি নদী হইবেন। স্বামী নারায়ণের আদেশে সরস্বতীর এক অংশ ব্রহ্মার স্ত্রী হইলেন। বাকী অংশ লইয়া তিনি নারায়ণের নিকট অবস্থান করিলেন।*

বেদে সরস্বতীর যে দ্বি-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণে এইভাবে তাহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল। বৈদিক যুগে প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই। পাণিনির আবির্ভাবের কাল খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী † ধরিলে পাণিনির আবির্ভাব-কাল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে হয়। পাণিনিতে প্রতিকৃতি-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, পাতঞ্জলে কোন কোন দেবতার মূর্ত্তি-সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দুগণও প্রতিমা গড়িত; কিন্তু ভাস্কর-শিল্প বৌদ্ধগণের

---

* সরস্বান্ শব্দের অর্থ প্রভূত জলবিশিষ্ট, ইহার পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী হরি দীর্ঘকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে জলশায়ী বলা হয় এবং তাঁহার পত্নী বাণীকে সরস্বতী বলা হইয়াছে।

† কাহারও কাহারও মতে পাণিনির আবির্ভাব-কাল আরও পূর্ব্বে।

হস্তেই চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্তূপ, চৈত্য, বুদ্ধের নানারূপ মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ভারত-বর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত ছাইয়া ফেলিল। যখন খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত-রাজগণের অভ্যুদয় হয়, তৎকালীন ক্ষোদিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বের প্রায় ৪শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগেই সুকল্পিত মূর্ত্তির প্রথম সৃষ্টি। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষ হইতে বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী ছিল না। অবশ্য: বুদ্ধের জীবনী-সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি আছে তাহাতে দেখা যায়, ব্রহ্মাদি প্রধান হিন্দু দেবগণ বুদ্ধের স্তব করিতেছেন; ইহা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, তখন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি হিন্দু-গণ পূজা করিতেন ও সেইগুলি কিরূপ হইবে সে-সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের বেশ ধারণা ছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক হিন্দু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপনা-দিগের দেবতাগণের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতা আপন নামে আশ্রয় পাইলেন। আর এক সম্প্রদায়ে তাঁহাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। ইন্দ্র বজ্র-পাণি রূপে, বিষ্ণু অবলোকিতেশ্বর-রূপে এবং ব্রহ্মা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ-রূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। মঞ্জুশ্রীর পত্নী হইলেন সরস্বতী বা বাগীশ্বরী। মঞ্জুশ্রীর অনেক প্রতিমূর্ত্তিতে বীণাবাদিনী একটী দেবী লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ইনিই মঞ্জুশ্রীর শক্তি-স্বরূপা সরস্বতী। একটি তিব্বতীয় প্রস্তর মূর্ত্তিতে দেখা যায়, সরস্বতী সুন্দর-ভঙ্গীতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ও বীণাবাদন করিতেছেন। যবদ্বীপস্থ যোগিয়োকোটায় সিংহাসনাসীনা এক সরস্বতী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; নূপুর ইঁহার বিশিষ্ট পরিচায়ক।

গান্ধার হইতে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় তাহা বাগীশ্বরী দেবীর প্রতিমা। ইনি সিংহবাহিনী ও বীণাবাদ্যরতা। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি বাগীশ্বরী-মূর্ত্তি আছে। দেবী উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন, দক্ষিণ চরণ একটি কমলের উপর ন্যস্ত। ইনি চতুর্ভুজা-মূর্ত্তি, নিম্নে একটি সিংহ।

মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তিতলে দুইটি সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। জাপানে অঙ্কিত মঞ্জুদেবতার কোন কোন মূর্ত্তিতে সিংহবাহন আছে। এইজন্য সম্ভবতঃ বাগীশ্বরীরও বাহন সিংহ। বৈদিক যুগে ঋষিগণ, ব্রহ্মা বেদবিদ্যা-পারদর্শী। পুরাণে আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদিশাস্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন হয় নাই। ব্রহ্মার বাহন হংস, সেইজন্য সরস্বতীর বাহনও হংস।

মৎস্য পুরাণ-মতে সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-অনুসারে সরস্বতী প্রথমে বিষ্ণুপত্নী, পরে তাঁহার এক অংশ ব্রহ্ম-পত্নী হ'ন। কিন্তু গরুড় ও মৎস্য পুরাণ-মতে পুষ্টি ও লক্ষ্মী বিষ্ণুর যুগল পত্নী। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে ইন্দিরা (লক্ষ্মী)

ও বসুমতী।" সুতরাং মনে হয়, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিযুগে বাণী বিষ্ণুপত্নীরূপে কল্পিত হইন। ব্রহ্মার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পৌরাণিকযুগে বিষ্ণুর প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও রামায়ণে ব্রহ্মার মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহরূপ ধারণের কথা আছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে ঐ সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের পৃথক্ উপাসনা করিতেন ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অভেদরূপও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার পরে ব্রহ্মপত্নী সরস্বতীর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সরস্বতী-মূর্ত্তিযুক্ত বিষ্ণুর প্রস্তর-মূর্ত্তিও অনেকটা আধুনিক।

তন্ত্রে বৌদ্ধ মঞ্জুঘোষকে বিকৃত করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাঁহার আকার-কল্পনায় বৈভিন্ন হয় নাই; তবে পূজার প্রণালী বীভৎস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাগীশ্বরী দেবীকে তন্ত্রে উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে। দেবীর ললাটে তরুণ শশিকলা, তিনি শ্বেতবর্ণা ও শ্বেত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা; তাঁহার হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি মালা-ও শুভ্রবস্ত্র-বিভূষিতা, চন্দনা-স্থলিপ্তদেহা, ললাটে চন্দ্রকলাধারিণী, শাঙ্ক্যম-বদনা ও ত্রিনয়না, * তাঁহার চারি হস্তে বাঁধামুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি হংসোপরি উপবিষ্টা; হস্তে বীণা, অক্ষসূত্র, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি ভালোন্মীলিত-লোচনা, পদ্মোপায় উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক। সর্ব্বস্থানেই তিনি মুক্তেন্দু-কুন্দপ্রভা ও তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা। তিনি প্রবোধপ্রদায়িনী এবং বাগ্বিভব-বৃদ্ধি-কারিণী। ধ্যানভেদে তাঁহার হোমে দুগ্ধ, তিল, মধুমিশ্রিত শ্বেত-পদ্ম, নাগকেশর, চম্পক ও আকন্দ-পুষ্পের প্রয়োজন হয়। এ মূর্ত্তি কল্পনায় আনিলে আধুনিক সরস্বতীর মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তন্ত্রে পারিজাত সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ইনি হংসারূঢ়া, শুভ্রবর্ণা, স্মিতবদনা এবং মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা। ইঁহার হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতময় ঘট এবং অক্ষমালা। ইঁহার হোমে আকন্দ, নাগকেশর, বা চম্পক পুষ্প ব্যবহৃত হয়।

তন্ত্রে মাতৃকা-দেবীকেও বাগ্দেবতা বলা হইয়াছে। মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি-পঞ্চাশদ্বর্ণময়। ইঁহার ললাটে ভাস্বর চন্দ্র বিরাজিত, চারি হস্তে মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা (পুস্তক)। ইনি বিশদ-প্রভাযুক্তা ও ত্রিনয়না।

দেবীগণের আকার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে বাগীশ্বরী, পারিজাত-সরস্বতী ও মাতৃকাদেবী সরস্বতীরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। ইঁহারা বর্ণময়কায়া; এই ভাবে কল্পিত হইয়াছেন। ললাটের চন্দ্রকলা বর্ণমালার চন্দ্রবিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কাত্যায়নীতন্ত্রানুসারে চণ্ডীপূজার সময় চণ্ডিকাদেবীর ত্রিভাবে ধ্যান করিতে হয়।

* বরাহ-অবতারে বিষ্ণু বসুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বসুমতীর পতি।

* বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় প্রতিমা লক্ষণে চতুর্হস্তা দেবী-মূর্ত্তির বিষয় বলা আছে;—বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম, এবং দক্ষিণ হস্ত-দুইটিতে অক্ষসূত্র ও বরাভয়।

এই ত্রিভাব তাঁহার তামসী, রাজসী ও সত্ত্বগুণাশ্রয়া মূর্ত্তি। প্রথম চরিতে তিনি মহাকালী, তাহার পরে মহালক্ষ্মী ও সর্ব্বশেষে সরস্বতী।

এই মহা সরস্বতী গৌরীদেহ-সমুৎপন্না, সর্ব্বৈক গুণাশ্রয়া, শুম্ভাসুরনিসূদনী। তাঁহার অষ্টহস্তে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল ও ধনু। যেন দেবী এই সকল অস্ত্রদ্বারা মোহরূপ শুম্ভাসুরকে বিনাশ করিতেছেন।

আমাদের সম্বন্ধে দু'একটী কথা।

সকলেই নারী-জাতির স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে লেখনী ধরেছেন। নারী ত চিরকালই সৃষ্টির আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সহসা তাহার কথা এত বিশদভাবে আলোচনা হওয়াতে মনে হইতেছে, বুঝি বা নারীর দুর্গতির এইবার অবসান হইবে। কিন্তু অনেক ভ্রান্তি এখনও নিজেদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কাগজে পড়ি যে, "কন্যা বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে পতির অধীনে ও বার্দ্ধক্যে সন্তানের অধীনে থাকিবে" —এই যে সনাতন প্রথা ইহা অতি লজ্জাকর ও গর্হিত প্রথা।' যাঁহারা ইহাকে এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের এরূপ মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাকবি মিল্টন বলিয়া গিয়াছেন—"Liberty means not License," "স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা বুঝায় না।" ঠিক কথা। বাল্যে পিতার অধীনে বা যৌবনে পতির অধীনে ও বার্দ্ধক্যে সন্তানের অধীনে যদি থাকা যায়, তবে কি নারীত্বের হানি হয়? বরঞ্চ একাধিক স্থানে দেখা গিয়াছে, ইহার বিপরীত হইলেই অশুভজনক ফল হয়। অধীনতা স্বাধীনতা করিয়া আমরা যতই চীৎকার করিব, ততই যে নিজেদের অধীন হইয়া পড়ি, তাহা বুঝি না কেন? এ পৃথিবীতে একেবারে কোন জিনিসে সম্পর্ক-রহিত হইয়া স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীনতা তো মনের,—ভাবার, বাক্যের কার্য্যের শুধু নয়; সে-সব তো পিতা-পুত্র-স্বামীর অধীনে থেকেও করা যায়। স্বাধীনতা মানে ইহা নয় যে, সমস্ত দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা করিতে হইবে এবং অধীনতা মানে ইহা নয় যে, দুনিয়াকে গ্রাহ্য করিয়া পিতাপুত্রপতির অধীনে কথায় কথায় উঠিতে ও বসিতে হইবে। আমার সন্দেহ হয়, যাঁহারা এ-সকল বিষয়ে লেখেন তাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া লেখেন না। শান্তি সুখ তো পিতার কাছে কন্যার বাধ্যতায়—পতির কাছে পত্নীর নম্রতায়—উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়। কন্যা যদি উচ্ছৃঙ্খল-ভাবাপন্ন হ'ন্ তাহা হইলে তরুণ বয়সে একজন তাহার উপরে না থাকিলে তাহাকে জীবন-পথে নানা প্রলোভনে পড়িতে হয়। কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হইলে উভয় পক্ষেরই অশান্তি। সে পিতার দারুণ মনঃকষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যদি কন্যার এই বাধ্যতাকে অধীনতা বলা যায়, তাহাতেও তো ক্ষতি নাই; তাহাতেই তো শান্তি পাওয়া যায়। মাতাপিতার ঋণ আজীবন শোধ করা যায় না। সামান্য বাধ্যতারূপ অধীনতা স্বীকার করিলে যদি

তাঁহাদের সুখী করা যায়, তবে কি তাহা করা উচিত নহে? হইতে পারে, স্থলবিশেষে পিতার মত ভুল, স্থলবিশেষে তাঁহার কথা রুচিকর নয়, কিন্তু তিনি পিতা অর্থাৎ পালনকর্ত্তা, এই হিসাবে কেন তাঁহার কথা শুনিয়া চলিব না। যেখানে কন্যা অধীন নয়, সেখানেই তাহার দুর্গতি; কিন্তু যেখানে অধীনতা আছে, সেখানে কন্যা পরম সুখী। পিতামাতা কখনো সন্তানের অহিতাচারণ করেন না। তরুণ বয়সে নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন অন্যায় পথে চলিতে যাই, তখন তাঁহারাই তো আসিয়া রক্ষাকর্ত্তা হন্ ও সে অধীনতা শুভ হইয়া যায়।

তৎপরে স্বামীর অধীনতা। বুঝিতেই পারি না, এখানে এই অধীনতা কোথায়? পরস্পর পরস্পরের কথাবার্ত্তায় মতামতে আদানপ্রদান ও সাহায্য করেন। এখানে কোন্ পক্ষ অধীন? দুই দিকেই তো সমান ভাব দেখা যায়। আর যদিই পত্নী পতির অধীন হ'ন, সে তো শ্লাঘার বিষয়। বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন না হয়ে চলাই তো অশান্তির মূল। যেখানে পত্নী পতির বশবর্ত্তী না হইয়া স্বকীয় অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে চলেন, সেখানে কি অশান্তি বর্ত্তমান! ইহার যত অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, তাহা সকলেই জানেন। স্বাধীনতা চাই, ভোট চাই, কিন্তু সে সব এইদিক্ বাঁচিয়ে চাওয়া চাই। ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, নয় তো ইহা হইতে অনর্থের সূচনা হয়। নিজের সংসারে শান্তি বজায় রাখিয়া জগতের কার্য্য করাটা ঠিক্ না, ব্যক্তিগত জীবনে রীতিমত অশান্তি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার খোঁজে বেড়ান পত্নীর পক্ষে ঠিক্?

আমি জানি, অনেকে আমাকে দোষ দেবেন, কিন্তু তাহাতে কি করা যায়। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই অপ্রিয়। বিবাহিত জীবনে তো স্বাধীন থাকা যায়। নিজের সংসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব থাকে; বাক্যে কার্য্যে সবেতেই তো পত্নী স্বাধীন। —অধীনতা কেবল যেখানে চরম কর্ত্তব্য সেখানে আসে। সেটা না মেনে চলাই পত্নীর অন্যায়।

বার্দ্ধক্যে মাতা পুত্রের অধীন। ইহা প্রথম শুনিতে বিশেষ ভাল লাগে না। কিন্তু এই অধীনতা যে স্বেচ্ছায়। ইহাতে দোষ নাই। যদি বাল্যে সন্তান মাতার অধীনে থাকেন, মাতা শেষবয়সে স্বেচ্ছায় সেই উপযুক্ত পুত্ররত্নের কথানুযায়ী চলিবেন। ধন্য সেই জননী, যাঁহার পুত্র চিরকাল মাতার বশবর্ত্তী ছিল এবং মাতাও বার্দ্ধক্যে স্বেচ্ছায় উপযুক্ত পুত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করেন না।

এই অধীনতা ও নম্রভাব, যেটীকে ইংরাজীতে Submissive mood বলে, তাহার অভাব যেখানে সেখানেই কন্যা পিতার অধীনতাকে অস্বীকার করিয়া, পত্নী পতির অধীনতাকে অস্বীকার করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হন। শেষে এমন অবস্থা আসে যে যদিও অনুতাপ হয়, তখন সেই স্বেচ্ছাচারিণী কন্যা পিতার কাছে মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ-স্থলে পত্নীর এই স্বেচ্ছাচারিতার পর পতি আর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করেন না। উভয়পক্ষের জীবন বিষময় হইয়া উঠে। এজন্য দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অধীনতাই ভাল, ঐরূপ স্বাধীনতা অপেক্ষা।

হিন্দুনারী এই অধীনতায় ধর্ম্ম পালন করেন বলিয়া হিন্দুনারীর স্বামিভক্তি বিখ্যাত। যাঁহারা স্বেচ্ছায় এ ধর্ম্মের বিপরীত পথে যাইবেন, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া লইবেন, কোন্ পথ ভাল।

শ্রীমণিকা রায় বি, এ,

সংবাদ।

(সংবাদ-পত্র হইতে সঙ্কলিত)

১। ভবানীপুরের স্নেহওয়ালী গোয়াদিনী নামে একটি হিন্দুস্থানী রমণী মৃত্যুকালে উইল করিয়া ভবানীপুর হাজরা রোডের উপর অনেকটা জমী পুণ্যকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। জমিটি তাঁহার জন্মভূমি শাহাবাদের কালেক্টর সাহেবের নামে দেওয়া হইয়াছে।—উদ্দেশ্য তাঁহার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। ঐ জমির মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা।

মরিবার সময় তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এই বলিয়া নালিশ রুজু করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্ব হইতে শরীরে অস্ত্র-প্রয়োগের জন্য তিনি অচৈতন্য ছিলেন, অতএব উইল করা ঠিক হয় নাই। বিচারপতি বিচারে বলিয়াছেন, উইল ঠিকই হইয়াছে,—উহার ভিতর কোন গোলযোগ নাই। এরূপ দানশীলতা আমাদের দেশে দুর্লভ। স্বর্গে তাঁহার আত্মা কল্যাণ লাভ করুক্।

২। শীত চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট-চূড়ায় আরোহণ করিবার জন্য আবার আয়োজন হইতেছে। জেনারেল ব্রুস ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিলাত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অভিযানকারিগণ কয়েক মাস পূর্ব্বে কতক দূর আরোহণ করিয়া শীত-আগমনের জন্য ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এখন হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল আসিলেই রীতিমত কাজ আরম্ভ হইবে।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তাঁহাদের কষ্ট সহিবার ক্ষমতা, শারীরিক শক্তি ও অধ্যবসায় থাকা চাই। এভারেষ্ট-শৃঙ্গে যাঁহারা আরোহণ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই পুরুষ। কেবল পুরুষই যে পর্ব্বতারোহণ-কার্য্যে পটু তাহা নহে। স্ত্রীলোকেও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

বহুদিন পূর্ব্বে কুমারী বাক্-নাম্নী এক রমণী উত্তর আমেরিকার প্রায় পৌনে তিন মাইল উচ্চ একটি গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেখানে উঁহার পূর্ব্বে কোন মানুষ যাইতে পারেন নাই। হেনরিয়েট্টা মিডেল্ নাম্নী চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া একটি ওলন্দাজ বালিকা অনেকগুলি দুর্গম পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন। বেশী দিনের কথা নহে, তিনি একবৎসরের ভিতর সুইট্জরল্যাণ্ডের দক্ষিণে ম্যাটারহর্ন ও ফ্রান্সের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে মণ্টব্লাঙ্ক্-নামক দুইটি প্রসিদ্ধ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সেই পর্ব্বত-দুইটির মোটামুটি হিসাবে উচ্চতা যথাক্রমে পৌনে তিন ও তিন মাইল। কুমারী রাসডা কসিও মণ্টব্লাঙ্ক ও

ব্রিফেল্হর্ন নামক পর্ব্বতের শিখর-দেশে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। কুমারী এডোয়ার্ড্‌স্ সর্ব্বপ্রথম দ্বিতীয় প্রকার শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

সকলের অপেক্ষা শ্রীমতী ফ্যানী বুলক-ওয়ার্কম্যান্-নাম্নী দুঃসাহসিকা রমণীর কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ। ইনি পতির সহিত হিমালয়ের অনেকগুলি দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণ করেন্। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি সাড়ে বার হাজার হাত (সাড়ে তিন মাইলের উপর) উচ্চ একটি শৃঙ্গে উপনীত হওয়া। তাহার পর তিনি যতগুলি শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাদের উচ্চতা যথাক্রমে তের হাজার হাত, তের হাজার আট শ' হাত, চৌদ্দ হাজার হাত, চৌদ্দ হাজার তিন শ' বত্রিশ হাত, পনের হাজার চল্লিশ হাত ও পনের হাজার পাঁচ শ' বত্রিশ হাত (প্রায় সাড়ে-চার মাইল)।

এভারেষ্ট-পর্ব্বতের উচ্চতা ঠিক জানা যায় না; প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল ধরা হয়। যে রমণী এতগুলি উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি চেষ্টা করিলে এভারেষ্টেও আরোহণ করিতে পারিতেন, বলিয়া মনে হয়।

৩। যুবরাজ ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সে-দিন তিনি ধর-রাজ্যে গিয়াছিলেন। ধর-রাজ্যে যখন তাঁহার আগমন-উপলক্ষে সৈন্যগণের কুচ-কাওয়াজ হইতেছিল, তখন অশ্বারোহি-সৈন্য-দলের নেতৃরূপে ধর-রাজ্যের মহারাণী যোদ্ধৃ-বেশে অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত আদেশ-দ্বারা বাহিনী-চালনা করিয়াছিলেন।

যুবরাজের আগমন উপলক্ষে গোয়ালিয়র-রাজ্যে যে কুচকাওয়াজ হইয়াছিল, তাহাতে গোয়ালিয়রাধিপতি মহারাজ সিন্ধিয়ার দশ বৎসর-বয়স্ক পুত্র ও আট বৎসর-বয়স্কা কন্যা ক্ষুদ্র বন্দুক স্কন্ধে লইয়া খাকী-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পদাতিক সৈন্যগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। ভারতসম্রাট্ জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর নামানুসারে মহারাজ সিন্ধিয়া তাঁহার পুত্র ও কন্যার নামকরণ করিয়াছেন।

৪। বিগত ডিসেম্বর মাসে কয়েকদিন ধরিয়া ভূপাল-রাজ্যের মহিলা পর্দ্দা-সমিতির উৎসব হইয়া গিয়াছে। একদিন শিশুপ্রদর্শনী হইয়াছিল। উহাতে বেগম-সাহেবা চারি বৎসরের অনধিকবয়স্ক সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্ তিনটী ও সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-পোষাক-পরিহিত তিনটী শিশুকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইবার জন্য এইরূপ প্রদর্শনী তিনি প্রতিবৎসরেই করিতে ইচ্ছুক। অপর একদিন বিভিন্ন বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া ও শারীরিক বলেরও প্রদর্শনী হইয়াছিল। ইহাতে বিজেত্রীগণ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। অপর একদিন সন্ধ্যাকালে ঐ সমিতির শিক্ষয়িত্রীগণ উর্দ্দু ভাষায় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, গৃহ-সেবা ও শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। বেগম-সাহেবা স্বয়ং এই সকল বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাও এই সময় বিতরণ করা হইয়াছিল। শেষ দিবস সন্ধ্যায় উদ্যান-সম্মিলনীতে প্রায় ১,০০০ রমণী উপস্থিত ছিলেন।

ভূপাল-রাজ্যের এই অভ্যুৎকর্ষ একদিনে সাধিত হয় নাই। বেগম-সাহেবার আন্তরিক যত্নের ফলে এইরূপ উন্নতি হইয়াছে। প্রচলিত পর্দ্দা-প্রথার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাবে দুর্ব্বল ও [illegible]

আক্রান্ত হ'ন দেখিয়া তিনি "মহিলা পর্দ্দা সমিতি" স্থাপন করেন এবং এই রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব-শাসনকর্ত্রী তাঁহার মাতার প্রাসাদস্থ অভ্যর্থনা-কক্ষ ও একটী মনোরম উদ্যান এই কার্য্যে ব্যবহারার্থ দিয়াছেন্। এই মনোহর উদ্যানে সমুদায় নারীকে সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে দুইবার মুক্তবায়ু ও রৌদ্র সেবনের জন্য সমবেত হইতে হয়। এই স্থানে তাঁহারা ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিতে পারেন এবং উৎসুক রমণীবৃন্দ আহতের প্রাথমিক শুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শিশুপালন-সম্বন্ধে স্ত্রীচিকিৎসকগণ যে উপদেশাবলী প্রদান করেন্, তাহা শ্রবণ করিতে পারেন্। বেগম-সাহেবার কনিষ্ঠ-পুত্রবধূ এই সকল উপদেশশ্রেণী মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসেন। গত বৎসর ও বর্ত্তমান বর্ষে ৩৬টী রমণী ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া নিদর্শন-পত্র-পাইয়াছেন। স্বয়ং বেগম-সাহেবাও কাহাকে কাহাকে ঐরূপ পত্র দিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের পরিবার-বর্গই প্রধানতঃ এই সকল উপদেশ-শ্রেণীতে যোগদান করেন। ইঁহার মধ্যে বৃদ্ধাও থাকেন্। ইহারা অধিকাংশই সন্তানের জননী এবং তাঁহাদের গৃহকার্য্যেরও বিরাম নাই; কিন্তু তথাপি এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে তাঁহাদের অসীম উৎসাহ।

বেগম-সাহেবার শিশু ও জননীদিগের হিতৈষণা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। বহুবৎসর পূর্ব্বে তিনি অশিক্ষিত ধাত্রীদিগের কার্য্যের কুফল উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন্। এই বিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেন এবং এখনও কয়েকটী বৃত্তি প্রদান করেন। তাঁহার এই সুব্যবহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই নগরের সমস্ত ধাত্রীই সুশিক্ষিত হইয়াছিল। ধাত্রীগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে নিদর্শনপত্র দেওয়া হয় এবং তাহারা যাহাতে তাহাদের সেই পূর্ব্বের অশুচি-প্রথা অবলম্বন না করে, এজন্য ঐসময়েই সাধারণ-সূতিকা-গৃহোপযোগি-দ্রব্যপূর্ণ একটী বাক্স দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসরে প্রায় ১৮টী করিয়া ধাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় যান্, কেহ কেহ বা নগরেই থাকেন্। ধাত্রীগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যও স্ত্রীচিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। সমুদায় নগরীটীকে চারিভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য এক এক জন স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা নিযুক্ত আছেন। কোনও স্থানে কোনও শিশুর জন্ম হইলে ধাত্রী তাহা তদ্বিভাগের স্বাস্থ্যপরিদর্শিকার নিকট নিবেদন করে; তিনিও তখন সেই ধাত্রীর সহিত প্রত্যেক স্থানে যাইয়া সমুদায় দেখিয়া আসেন এবং কোনও ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতিবিধান করেন্। কোনও অস্বাভবিক স্থলে ধাত্রী স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিলে হাঁসপাতালের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া পাঠান হয় অথবা রোগিণীকে তথায় প্রেরণ করা হয়। এই প্রকারে বহুজননী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। এই সকল কার্য্য ব্যতীত স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকাদিগকে তাঁহাদের এলাকার প্রত্যেক বাটীতে যাইতে হয় এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হয়। প্রতিবৎসর দ্বিসহস্রাধিক প্রসূতি ইহাদিগের সহায়তা লাভ করিয়া থাকেন।

চারিটী জেলার শিক্ষিতা ধাত্রীবিদ্যার উপদেষ্ট্রীও আছেন্। ইহারা গ্রামের ধাত্রীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন্ এবং তাহাদিগকে ঐবিষয়ে উপদেশ দেন। ধাত্রীগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে প্রতিবৎসর তাহাদিগকে ভূপাল-নগরে আনয়ন করিয়া পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক জেলায় প্রতিবর্ষে প্রায় দশটী করিয়া ধাত্রী উত্তীর্ণা হয় এবং মাসিক ৬৲ টাকা বৃত্তি পায়। প্রত্যেক উপদেষ্ট্রীর দশটী করিয়া ধাত্রীকে শিক্ষা দিতে হয়। উপদেষ্ট্রীগণ রাজ্য হইতে বেতন প্রাপ্ত হ'ন।

এই ভূপালরাজ্যে নারীদিগের জন্য একটী বৃহৎ রোগিনিবাস আছে। এই স্থানে বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধাদি পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত জেলায় জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। নিঃস্ব ও পরিত্যক্ত শিশুদিগের জন্য উক্ত রোগিনিবাস-সংলগ্ন একটী বাটী আছে। এইস্থানে ঐপ্রকার শিশুদিগকে স্ত্রীচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখা হয়; তৎপরে শিক্ষার নিমিত্ত অনাথ বালক বা বালিকাদিগের আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পুস্তক-সমালোচনা।

জীবন-সংগ্রাম।—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। একটি গল্পের সাহায্যে প্রাচীন ও অভিজ্ঞ গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, জীবনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ঘটনা-চক্রের বিরুদ্ধে কিরূপ সংগ্রাম করিতে হয়। সাংসারিক জীবনে মানুষের অদৃষ্টে কত কি ঘটে, চরিত্র-বলে মানব কিরূপ উন্নতি লাভ করে, অসৎসঙ্গে তাহার কিরূপ অধঃপতন হয়—এইরূপ নানাপ্রকার ঘটনারাজির সন্নিবেশ-দ্বারা গ্রন্থের নাম সার্থক করা হইয়াছে। এই সংগ্রামে যোগ্যতম ব্যক্তিই জয়লাভ করে। নায়ক নরেন্দ্র সদ্বংশজাত, উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত, সচ্চরিত্র ও সৎসাহসী যুবক। এ চরিত্র নিখুঁত ও নিপুণভাবে অঙ্কিত। মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য অর্থের প্রলোভন, মণিয়ার রূপের প্রলোভন তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রের একটা লক্ষ্য ছিল। নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইতে তিনি কিছুতে বিচ্যুত হইতেন না। আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে না পারিলে তিনি বিবাহ করিবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প ছিল। যখন পিতৃবন্ধু পরম উপকারক শরৎবাবু তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তিনি জীবনের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া এ-বিবাহে অমত করিলেন। তথাপি ইহাতে তাঁহার চরিত্র গ্রন্থকারের নিপুণতার জন্য হেয় হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার ভ্রাতার বিবাহের সময় তাঁহার মাতাপিতা অর্থ লইতে ইচ্ছা করিলেন। নরেন্দ্র নিজে দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন; তিনি দরিদ্রের কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিয়া দরিদ্রের উপকার করিলেন এবং তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে কন্যার দরিদ্র পিতা নরেন্দ্রের জনক-জননীর সন্তোষ-বিধান করিলেন।

পুরুষের দশদশার মধ্যে চাকুরীকেও একটি দশা বলা যাইতে পারে। চাকুরী করিয়া নরেন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। উৎকোচ-অত্যাচারে হস্ত কলুষিত না করিয়া তিনি একটি ভীষণ মহাল শাসন করিলেন; নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া দস্যুর আক্রমণের শাস্তি দিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার ব্যবসায় শঠতাপ্রবঞ্চনাহীন খাঁটি ভদ্রলোকের ব্যবসায়। তাহা সাধুতা, সদ্বুদ্ধি ও পরিশ্রমের নিদর্শন। নিয়ম, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমে ব্যবসায়ে কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, এই পুস্তক হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। খুড়া মোহনলাল নরেন্দ্রের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পাপের শাস্তি পাইয়া নরেন্দ্রের আশ্রয়েই তাঁহাকে জীবন কাটাইতে হইয়াছিল। সংসারধর্ম্ম-পালন করিয়া নরেন্দ্র জীবনের শেষদিনগুলি ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিলেন।

ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাতে ভাষার আড়ষ্টতা নাই ও সমাসের আড়ম্বর বা বাহুল্য নাই। পুস্তকখানি সুন্দর সোনার জলে বাঁধান।—মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 704. April, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।	চৈত্র, ১৩২৮। এপ্রিল, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭০৪ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

তোমার সময়।

তুমি কখন্ এসে দাঁড়াও পাশে
নাই তো ঠিকানা;
ওগো তোমার সময় কখন্ হবে
কেউ তা' জানে না!
কোনো গানের কোনো তানে,
কোনো প্রাণের কোনো টানে,
সকল-দেহ-জীবন-দানে
তোমায় মিলে না!

অকারণের কোন্ কারণে
তোমার আগমন,
তুমিই শুধু জান সখা,
তোমার প্রয়োজন!
জীবনব্যাপী সাধন ভজন,
বাড়ায় আরো বোঝার ওজন,
তুমি জান তোমার বজন,
এমনি ছলনা!

দরবেশ।

শিশুর শিক্ষায় মণ্টেসরী।

এই বিংশ-শতাব্দীতে যিনি শিশুর শিক্ষা-রাজ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি একজন বিদুষী রমণী। গত শতাব্দীতে ফ্রোবেলের 'কুমার-কানন'-বিদ্যালয় যেরূপ সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই রমণীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সেইরূপ সমস্ত সভ্য-জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে বহু তত্ত্বপিপাসু নরনারী এই বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালী দেখিবার জন্য রোমনগরে আগমন করিতেছেন। যে ইতালী শিক্ষাদীক্ষা-ব্যাপারে এতদিন য়ুরোপের অন্যান্য

সভ্যদেশ ও আমেরিকার অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল, আজ সেই ইতালী-দেশের একজন রমণী শিশুর শিক্ষারাজ্যের পথ-প্রদর্শক-রূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা ইতালীর পক্ষে যেরূপ শ্লাঘার বিষয়, রমণীজাতির পক্ষেও তদ্রূপ গৌরবের বিষয়।

এই রমণীর নাম মণ্টেসরী। ইনি রোম-নগরের একজন মহিলা ডাক্তার। চিকিৎসা-কালে ইঁহাকে শিশুদিগের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করিতে হইত। এই মস্তিষ্কের পরীক্ষা-ব্যাপারে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক শিশুগণের শিক্ষাদানের প্রণালী স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। এইরূপে শিশু লইয়া কার্য্য করিতে করিতে তিনি শিশুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক-শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষাগারে যে সকল শিক্ষা-সূত্র স্বকীয় গবেষণা-বলে উদ্ভাবন করেন, সে সকল অবলম্বন করিয়া এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের একাগ্রতা ও সমাজ-সেবকের হৃদয় লইয়া তিনি শিশুর শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার নবাবিষ্কৃত শিক্ষাতত্ত্ব ও ফ্রোবেলের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় যে, কেহ কেহ মণ্টেসরীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে এক প্রকার কুমার-কানন-বিদ্যালয় বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে যে মণ্টেসরী নূতন কথা প্রচার করিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ সকল মূলসূত্রের প্রয়োজন-বিষয়ে তিনি যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যাহা হউক, উভয় প্রণালীর মূলতত্ত্বের তুলনা-মূলক সমালোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু মণ্টেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতির একটু সামান্য আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

মণ্টেসরীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম "শিশুগৃহ" (Casa dei Bambini or Children's Home)। "শিশুগৃহ" এই নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য বা সার্থকতা আছে। এই বিদ্যালয়ে শিশুগণ নিজগৃহের ন্যায় স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছামত যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পারে। বিদ্যালয়-গৃহকে কারাগার-তুল্য অপ্রীতিকর স্থানে পরিণত না করিয়া, উহাকে সর্ব্বতোভাবে গৃহের ন্যায় প্রিয় ও চিরানন্দময় স্থানে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও আয়োজন করা হইয়াছে।

এই শিশু-বিদ্যালয় একটি প্রকাণ্ড গৃহ-বিশেষ। এখানে বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে; ঘরে ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার সাজান রহিয়াছে। সেগুলি এত হাল্কা যে, শিশুগণ অনায়াসে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে তাহা লইয়া যাইতে পারে। বাহিরের দিকে যথেষ্ট উন্মুক্ত স্থান; সেখানে শিশুগণ ছুটাছুটি ও খেলা করিতে পারে।

প্রতিগৃহে মাত্র ত্রিশটি শিশুর শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে একজন তত্ত্বাবধায়িকা বা শিক্ষয়িত্রী ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তিতে অথচ অবহিত-ভাবে বসিয়া আছেন। শিশুগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতেছে, এবং কখনও কখনও শিক্ষয়িত্রীর নিকট পরামর্শ গ্রহণের জন্য নিজ হইতেই আগমন

করিতেছে। শিক্ষয়িত্রী অনাহূত-ভাবে গায়ে পড়িয়া শিশুদিগকে কোনও কথাই বলিতেছেন না। এখানে শিশুদের বয়স সাধারণতঃ তিন হইতে ছয় বৎসর।

গৃহের এক কোণে একটি পিয়ানো(Piano) রহিয়াছে। কোনও শিশু পিয়ানোর পাশে উহার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও খেলা করিতেছে; কোনও শিশু বা ক্লান্তি অনুভব করিয়া গৃহতলে বিস্তৃত সুকোমল গালিচার উপর শুইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীর-গাত্রে কোমল-মতি শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙ্গান আছে। কোথাও বা শিশুদিগের জল-সেচন-পরিপুষ্ট গাছপালা জানালার পশ্চাতে পাত্রবিশেষে সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও বা গৃহের এক কোণে হাত-মুখ ধুইবার জন্য জলপূর্ণ পাত্র আছে এবং উহার আশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট বাটী ও ছোট কলসী পড়িয়া রহিয়াছে। খেলিতে খেলিতে যখন শিশুগণের হাতে মুখে ময়লা বা মাটি লাগিতেছে, তখন তাহারা এখানে আসিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ গৃহে মাতা শিশুগণের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করেন, এখানে তাহার কোন ত্রুটি হইতেছে না। সুতরাং এ বিদ্যালয়ের "শিশুগৃহ" এই আখ্যাটি অতিশয় উপযোগী হইয়াছে। কারণ, সুসংযত ক্রীড়া-কৌতুকের ও শিক্ষাপ্রদ আমোদ-জনক কার্য্যের সমাবেশ এখানে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়।

শিশুদিগের দায়িত্ববোধের উদ্রেকের জন্য অতিসুন্দর উপায় অবলম্বন করা হয়। শিশুগণ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিদ্যালয়-গৃহ নিজ-হস্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। এজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্মার্জনী ও আবর্জ্জনা রাখিবার ছোট ছোট পাত্র "শিশুগৃহে" ব্যবহৃত হয়। শিশুগণ নিজেই হাতমুখ ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রাতঃকালে বেশ-ভূষা করে। তাহারা পরস্পরকে ভাইবোনের ন্যায় ভালবাসে। কখনও কখনও কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাহারা দুই তিন জন মিলিয়া এক একটি দল করে; কখনও কখনও চারি পাঁচ জন মিলিয়া দল বাঁধিয়া খেলা করে; কখনও বা দশ বার জন মিলিয়া পিয়ানোর তালে তালে এক সঙ্গে নৃত্য করে। গৃহের বাহিরে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ। সেখানে নানাপ্রকার সজীব গাছ-পালা ও সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ সজ্জিত। খেলায় মাতিয়া শিশুগণ সেখানে দলে দলে ছুটাছুটি করিতেছে। পড়া-শুনা করিবার জন্য কেহই তাহাদিগকে খেলা হইতে বিরত হইতে বলিতেছে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ সুবিধা ও স্বাধীনতা পাইয়াও তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া-রত থাকিতে চায় না। কতক্ষণ পরে নিজ হইতেই তাহারা লেখা-পড়া ও গণনা প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করে। স্বাধীনতার অপব্যবহার চিরাবরুদ্ধ শিশুগণ যেরূপ করে, ইহারা কখনও সেরূপ করে না।

আর এই সকল শিশুগণ যখন পড়াশুনা ও গণনা প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ে নিযুক্ত হয়, তখন সে-দিকে তাহাদের এত গাঢ় অভিনিবেশ হয় যে, তাহারা সেই অল্প সময়ের মধ্যে যে-পরিমাণ শিক্ষা লাভ করে, নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষক যে পাঠ প্রদান

করেন, তাহা হইতেও সেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষার বিষয়-গুলিকে নানাভাবে এরূপ চিত্তাকর্ষক করা হয় যে শিশুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে-সকল কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করে। জোর করিয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় না; কারণ, প্রকৃত শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উহার মূল্য অতি অল্প।

প্রাতঃকাল হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন শিশুগণ সাধারণতঃ মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষার উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি (Apparatus) লইয়া কার্য্যে রত হয়। মধ্যাহ্নবেলা শিশুগণ নিজেরাই খাদ্যাদি পরিবেশনের বন্দোবস্ত করিয়া আহারে বসিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর এই ভার অর্পিত হয়। তাহারা আহারের টেবিল সাজাইয়া, পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করে এবং আহারের অন্যান্য দ্রব্য পরিবেশন করে। এই ছোট ছোট শিশুদিগকে টেবিল সাজাইতে দেখিলে মনে এক অপরূপ আনন্দের উদয় হয়। চারি পাঁচ বৎসরের শিশুগণ ছুরি, চামচ, কাঁটা প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গীদিগকে বিলাইতেছে; কেহ কেহ বা থালাতে (Tray) করিয়া একবারে ৫।৬টি জলপূর্ণ গ্লাশ লইয়া আসি-তেছে; কেহ কেহ বা পাত্র ভরিয়া গরম স্থপ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে সঙ্গীদিগকে যোগাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই কোনরূপ ত্রুটি দেখাইতেছে না। কোন গ্লাশ ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা স্থপ পড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না। শিশুগণ কিরূপ ক্ষিপ্রতাসহকারে কার্য্য করিতেছে, এবং অপরেরা কিরূপ সুসংযতভাবে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেছে, তাহা দেখিলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আহারাদির পর আবার শিশুগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কেহ কেহ খেলার মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে, কেহ কেহ ফুলের গাছে যত্নসহকারে জলসেচন করে, কেহ বা মনের সুখে আরামে যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমায়। কিন্তু অধিকাংশ শিশুই মণ্টে-সরীর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি লইয়া নানাভাবে অতিশয় আনন্দসহকারে বাড়ী যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টুকু কাটাইয়া দেয়। মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলি বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে এরূপ যত্ন- ও কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে তিন হইতে সাত বৎসরের শিশুগণ নিজ হইতেই অনেক শিক্ষালাভ করে।

এইরূপ শিশুবিদ্যালয় আমাদের দেশের উপযোগী কি-না ভাবিবার বিষয়। মণ্টেসরীর শিশুবিদ্যালয়ের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে এইরূপ বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। তাহার পর, ছাত্রের কথা। বঙ্গদেশে এরূপ মাতাপিতা খুব কমই আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদিগকে শিক্ষার জন্য দিবসের সমস্ত সময় বিদ্যালয়ে রাখিতে সম্মত হইবেন। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া আমরা যদি অন্ধের ন্যায় মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি এদেশে চালাইতে যাই, তবে সফলকাম হইব কি-না সন্দেহ। ঠিক্ এই কারণেই আমাদের দেশে "কুমার-

কানন’-শিক্ষ-পদ্ধতি নিষ্ফলপ্রয়াসে পরিণত হইয়াছে। যদিও এইরূপ বিদ্যালয় এদেশে স্থাপন করিবার সময় এখনও হয় নাই, তথাপি শিক্ষিত মাতাপিতা তাহাদের নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষাভার নিজ-হাতে লইতে পারেন। মণ্টেসরীর শিক্ষাদান-প্রণালী স্থানভেদে প্রয়োজন-মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে তাঁহারা আশাতীত ফললাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মণ্টেশরী বলেন—“প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি অপর শিশুর প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আবার শিশুর প্রকৃতি চিরপরিবর্ত্তনশীল ; নিত্যই নূতন। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে এক এক জন শিশুর জন্য এক এক জন শিক্ষকের প্রয়োজন।”

ইহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি ? সকলের পক্ষে যদিও ইহা সম্ভবপর না হউক্, শিক্ষিত জনকজননীগণ এই শিক্ষকের স্থান অধিকার করিতে পারেন। আমাদের দেশের জনকজননীগণ শিশুর শিক্ষার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা জানেন না বা জানিতে চান না যে, শিশুর শিক্ষাভার তাঁহারা নিজহস্তে লইলে যত সহজে ও স্বভাবানুমোদিত পথে শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষক শত শিক্ষিত হইলেও তাহা পারিবেন কি-না সন্দেহ। শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে যে খুব বিদ্যার প্রয়োজন, তাহা নয়। তবে শিশুচরিত্রটি ঠিকভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, এবং শিক্ষার মূলসূত্র-সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মণ্টেসরীর মতে শিক্ষার যে কয়টি মূলসূত্র, সেগুলি অবশ্য অনুসরণীয়। উহাদের উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী প্রবন্ধে মণ্টেসরীর ক্রীড়নক ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) শিশু নিজকেই নিজে শিক্ষা দিতে পারে ; অপরের পক্ষে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। শুনিয়া শিখা বা দেখিয়া শিখা অপেক্ষা, নিজে করিয়া শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং শিশু প্রত্যেক বিষয় নিজের চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা করিবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্ব-ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিয়া শিশু যাহা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঞ্চয় দিন দিন বৃদ্ধি করে। পরদত্ত শিক্ষায় তাহার জ্ঞানের উৎস বরং দিন দিন শুষ্ক হইয়া পড়ে।

(২) শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুর উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; শিশুকে জোর করিয়া কোনও বিশিষ্ট কল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির উপযোগী করিবার চেষ্টা করা স্বভাব-বিরুদ্ধ।

(৩) শিক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, শিশু যেন সেইরূপ শিক্ষালাভ করিতে আগ্রহ-ভরে নিজের ইচ্ছায় অগ্রসর হয়, এবং উহাতে সে যেন এরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, যাহা তাহার পক্ষে অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

খুকী।

কত সুধা মাখা আছে ওই কচিমুখে!—
কাঁদিলেও সুধা ঝরে, হাসিলেও সুধা ক্ষরে ;
সতত আনন্দে যেন ভাসিতেছে সুখে।
খেলায় নহেক ক্লান্ত, নির্ম্মল হৃদয় শান্ত,
স্বর্গীয় হাসিটী সদা বিরাজে অধরে।

হৃদয়ে নাহিক জ্বালা, পবিত্র মন্দার মালা
সতত ফুটিয়া যেন রয়েছে আদরে ;
নাহি আত্ম-পর-জ্ঞান, বিমল পবিত্র প্রাণ ;
হাত পাত, ছুটি যাবে ঝাঁ'প্ তা'র কোলে।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

নারীগণের মুখরতা-দোষ।

শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্রই কোমলপ্রাণা নারীদিগের প্রিয়বাদিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ রমণীগণের প্রিয়বাদিত্ব যেমন একটী স্বাভাবিক গুণ, মুখরতা তেমনই একটা দোষ। এই নারী-স্বভাব-প্রতিকূল দোষটী অনেক সময়ে নারীগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাদিগকে পুরুষোচিত কঠোরতা-প্রদানপূর্ব্বক উপবনতুল্য শান্তিময় সংসারকে ভীষণ কণ্টককাননে পরিণত করিয়া থাকে। তখন গৃহস্বামীর পক্ষে তথায় বাস করা একরূপ দুরূহ হইয়া উঠে। যখন স্বামিগণেরই এই দুর্দশা, তখন এই মুখরাদিগের কল্যাণে সংসারের অপর সকলের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলেই 'পলাই' 'পলাই' ডাক ছাড়িয়া থাকে!

স্ত্রীলোকদিগের এই মুখরতা-দোষটী তাহাদের নারীজনোচিত নম্রতা, লজ্জাশীলতা, সৌজন্য ও আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাবেই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য দেখা যায়, যে নারী নম্রা নহে, অর্থাৎ গর্ব্বিতা, সে প্রায়ই মুখরা হইয়া থাকে। কারণ, গর্ব্ববশতঃ সে আর কাহাকেও বড় গ্রাহ্য করে না, এবং সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিয়ত উচ্চকণ্ঠে নিজের মহিম-জ্ঞাপক ও অপরের হীনতা-প্রতিপাদক বাক্যরাশি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

কোন ধনী লোকের কন্যার দরিদ্রের গৃহে বিবাহ ঘটিলে, সেই ধনিকন্যা যে প্রায়ই মুখরতা অবলম্বন করিয়া থাকে, ইহার কারণ ঐ কন্যার পিতার ঐশ্বর্য্যজনিত গর্ব্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। একজন বিদুষী রমণীর মূর্খ পতির প্রতি যে মুখর ব্যবহার দেখা যায়, তাহার বিদ্যাজনিত গর্ব্বই উহার কারণ। কুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে লজ্জাশীলতার তারতম্যানুসারে মুখরতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের এই লজ্জাশীলতা গুণটী প্রকৃতিগত হইলেও উহা তাহাদের স্বাধীন ও অধীন অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা বেশী। কারণ, পল্লীগ্রামে লোকের বসতি অল্প। এতদ্ব্যতীত অনেক মুক্তস্থান থাকায় তাহারা তথায় নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে ; স্বাধীনভাবে পথে গমনাগমন করিতে পারে, তীর্থস্থানে স্নান করিতে যাইতে পারে,

অপর পল্লী-কামিনীর বাটীতে দেখা শুনা করিতে যাইতে পারে, পল্লীর কোন উৎসব-স্থলে মুক্তপ্রাণে যোগদান করিতে পারে, এবং পুরুষের বিরলতা থাকায় পরস্পর মুক্তকণ্ঠে দুইদণ্ড আলাপ করিতে পারে। সহরে লোক-বাহুল্য-বশতঃ পথে বাহির হওয়া দূরে থাকু, পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে যাইতে হইলেই শিবিকার বন্দোবস্ত করিতে হয়; এবং কোনরূপ স্বাধীনতা না থাকায় তাহারা একএকটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে কূপমণ্ডূকের মত অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলে পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই একটু লজ্জাহীনা থাকায় তাহাদের মুখরতা সহরবাসিনীদিগের অপেক্ষা কিছু অধিক। *

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বাধীনতা যদি মুখরতার অন্যতম কারণস্থল হইল, তবে যে দেশে বা জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বর্ত্তমান আছে, সে দেশের স্ত্রীলোক-মাত্রই কি মুখরা হইবে? না, তাহা নহে। স্বাধীনতা থাকিলে মুখরতা দোষ যতটা আসিতে পারে, স্বাধীনতা না থাকিলে ততটা আসিতে পারে না। তবে স্বাধীনতা থাকিলেই যে মুখরতা দোষ আসিবে, এ-কথা যুক্তিযুক্ত নহে। খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদিগের ত স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকল খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকই মুখরা? স্বাধীনতা থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ পুরুষোচিত যে যে দোষ আসিতে পারে, শিক্ষাদ্বারা তাহা দমিত করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোককে যদি বিনয়, সৌজন্য বা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বাধীন হইলেও বর্ব্বরোচিত মুখরতা-দোষ কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। কারণ, সে প্রতিলোকের সহিত আলাপের সময়েই বুঝিবে যে "সকলের সহিতই বিনীত ও সাধু আচরণ করা উচিত, এবং সেইরূপ করিতে হইলে রূঢ় বা শ্রুতিকঠোর বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে, এবং যদি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে নারীগণের মাধুর্য্যময় স্বভাবের জন্য যে একটু মর্য্যাদা আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়।" বাস্তবিক প্রত্যেক নারীরই বিনয়-সৌজন্যাদি গুণের সহিত আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নারীগণ অনেক-সময় ভ্রান্তিবশতঃ বুঝিতে না পারুক, সকল দেশে সকল জাতিই নারীগণকে মহনীয় আসন প্রদান করিয়াছে। নারী হইতে জগৎ উৎপন্ন, নারীর ক্ষীরধারায় উহা পরিপুষ্ট, নারীর মাতৃভাবে উহা রক্ষিত। স্নেহের মন্দাকিনী, পবিত্রতা, কোমলতা ও মাধুর্য্যের খনি, প্রকৃতিরূপিণী নারীকে কোন্ পুরুষ না সম্মান সহকারে দর্শন করিয়া থাকেন? সেই-টুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান রাখিতে গেলে নারী-গণকে চরিত্রগত সকল লঘুতা বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবময় জীবন ধারণ করিতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছি যে, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, সে দেশে রমণীগণের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে, সেই আত্মসম্মান-জ্ঞানের প্রভাবে তাহারা মুখরতা প্রভৃতি কোনরূপ লঘুতা অবলম্বন করে না। কিন্তু বিনয়,

* স্বাধীনতা স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতা নষ্ট করিতে পারে এবং লজ্জাশীলতার অভাব মুখরতা আনয়ন করিতে পারে। পল্লীবাসিনী নারীর উদাহরণ-দ্বারা উল্লিখিত বিষয় বুঝান হইয়াছে মাত্র। পল্লীবাসের দোষগুণ-বিচার লেখকের উদ্দেশ্য নহে। লেঃ

সৌজন্য ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের অভাব থাকিলে স্বাধীনতা যে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোককে মুখর করিয়া তুলে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

উপরে যে মুখরতার কারণগুলি লিখিত হইল—বিনয়, লজ্জাশীলতা, সৌজন্য ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের অভাব,—এইগুলি নারীগণ অধিকাংশস্থলে মাতাপিতার চরিত্র হইতে লাভ করিয়া থাকে, এবং তত্তদ্দোষ-বিশিষ্ট মাতাপিতার সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের ঐ দোষগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে; এবং সমাজে বা পল্লীতে সেই সেই দোষের দৃষ্টান্ত-বাহুল্য থাকিলে, নারীগণ সংসর্গনিয়মে সেই সেই দোষের অধিকারিণী হইয়া পড়ে। এই জন্য লোকে কোন নারীকে মুখরতা-দোষে দুষ্টা দেখিলে প্রায়ই নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে "ও আবার মুখরা হইবে না? কেমন মা-বাপের মেয়ে! কেমন বায়গায় বাড়ী!" ইহা অবশ্য মাতাপিতা ও সমাজের পক্ষে বিশেষ কলঙ্কের কথা! এইজন্য কোন নারীকে গুণবতী করিতে হইলে, মাতাপিতার গুণবান্ হওয়া চাই, এবং সে যে সমাজে বাস করে, সে সমাজেও নানাবিধ গুণের সদ্দৃষ্টান্ত থাকা চাই। কারণ, পুস্তকগত বা মৌখিক উপদেশ-দ্বারা যতটা শিক্ষা দেওয়া যায়, এক সদ্দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ও স্থায়ী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের ভারতবর্ষীয় সংসারের সর্ব্বপ্রধান কল্যাণকর শান্তিময় জিনিষ একান্নবর্ত্তিতা। একান্নবর্ত্তিতার অর্থ—মাতা, পিতা, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলের একযোগে পরস্পর স্নেহ-সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক অন্নে অবস্থান। ঈদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে হইলে সংসারে কিরূপ উদারতা, নিঃস্বার্থতা, ধৈর্য্য ও প্রীতির বাঁধ দিয়া রাখিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুখরতা সংসারে সে সুদৃঢ় বাঁধটী ভাঙ্গিয়া ফেলে! কারণ মুখরা নারীর অহর্নিশ শ্রুতিকর্কশ-শব্দে সংসারের অপর পরিজনবর্গ ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়ে, এবং ধৈর্য্যের বন্ধনটী খসিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে উদারতা, নিঃস্বার্থতা ও প্রীতির বন্ধনও উন্মুক্ত হয়, এবং সংসার তখন সম্পূর্ণভাবে মুক্তপ্রান্তরের মত পতিত হওয়ায় অশান্তিনিচয় সবেগে তাহাতে প্রবেশ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মানুষের কথা দূরে থাকুক, মধুর ব্যবহার, কি মধুর আলাপে যখন আত্মমর্য্যাদারহিত বন্যপশু পর্য্যন্তও বশীভূত হয়, তখন আত্মমর্য্যাদাযুক্ত মানব কেন আর একজনের কর্কশ বাক্য অনবরত সহ্য করিতে যাইবে? বিশেষতঃ একজনের নিকট কোনরূপ উপকার পাইতে হইলে মধুর-সম্ভাষণ-দ্বারা তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া যতটা পাওয়া যায়, প্রভুত্বপূর্ণ কর্কশ-বাক্য-প্রয়োগদ্বারা ততটা পাওয়া সম্ভবপর

---

* এই স্বাধীনতা হইতে রীতিমত শিক্ষার অভাবে লজ্জাহীনতা, মুখরতা প্রভৃতি বিবিধ দোষ উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদিগের পবিত্র ও গৌরবময় মাতৃভাব নষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় বিজ্ঞ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে চাহেন নাই।

কিন্তু তাঁহারা কোনরূপ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া অথবা নির্য্যাতন-স্পৃহায় নারীগণকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই; কারণ তাঁহারাই বলিয়াছেন,—

"যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

নহে, এবং সেরূপ করিতে যাওয়া নিজের মূর্খতা-ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর যদি কেহ উপকার করিয়া নিজকৃত উপকারের দোহাই দিয়া উপকৃতের প্রতি প্রভুত্বময় কর্কশ সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে সে যে তাদৃশ ব্যবহারের দ্বারা গোমূত্রদূষিত দুগ্ধের মত তাহার কৃত উপকারটীকে সম্যক্ নষ্ট করিয়াই থাকে, ইহা না ভাবাই তাহার অবিবেচনার বিষয়। বিশেষতঃ পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী না হইয়া কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া কোন মানবই কার্য্যবহুল জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। সেইজন্য একান্নবর্ত্তী সংসারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করিয়া আপন আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ হয় ত, অর্থ দিয়া সাহায্য করিল, কেহ হয় ত অর্থ না থাকায় জীবনপাতী পরিশ্রম দিয়া প্রত্যুপকার করিল। কেহ কাহারও বাল্যকালে লালন-পালনের ভার লইয়া সাহায্য করিয়াছে, আবার সে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় লালন-পালনের ভার লইয়া প্রত্যুপকার করিতেছে। এইরূপ পরস্পরের একটা না একটা সাহায্যের উপর যখন সংসারটী গঠিত, তখন একজন যদি মূর্খতা-বশতঃ নিজের কৃত উপকারটীকে অধিকতর বহুমানপূর্ব্বক নিজ কল্পনায় উপকৃতকে আপনার অপেক্ষা হেয় মনে করিয়া সুতীব্র সম্ভাষণ-দ্বারা আপ্যায়িত করিতে যায়, তাহা হইলে অপরে যে তাহার বাক্যবাণে অধীর হইয়া বিদ্রোহানল উপস্থিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শুধু উপকারিত্বের দাবী দিয়া নয়, কেহ কেহ বয়োজ্যেষ্ঠতার দাবী দিয়া, কেহ কেহ বা স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার দাবী দিয়া, কেহ বা সমৃদ্ধ পিতৃকুলগৌরবের দাবী দিয়া, কেহ বা কর্তৃত্বের দাবী দিয়া সংসারের অপর সকলকে নিজ অপেক্ষা হীনতর মনে করিয়া তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে চান্। আবার কখনও বা স্বকীয় স্বভাব-বশতঃ বিনা কারণেই অর্থাৎ কাহারও প্রতি কোনরূপ হীনবুদ্ধি পোষণ না করিয়াই মুখরতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রকৃতিগত সৌজন্যের অভাব তাহাদের সেই মুখরতার কারণ। কুল-নারী-গণের মধ্যে যে কারণেই মুখরতা দোষটী উৎপন্ন হউক না কেন, একজনের মুখরতা থাকিলেই সংসারের শান্তিপথে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, একাধিকের থাকিলে ত কথাই নাই! কোন সংসারে একাধিক মুখরা নারী থাকিলে একটা অতিতুচ্ছ কারণে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা এত প্রবল হইয়া থাকে যে তাহাদের উচ্চরবে সমস্ত পল্লী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন কি সময়ে সময়ে কলহমূলক কোলাহল শুনিয়া সেই গৃহস্থের বাটীতে অগ্নিসংযোগাদি-বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহু বাহিরের লোক সমবেত হইয়া পড়ে। তাহাতে সেই মুখরা নারীগুলির ত আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত সংসারেরও মর্য্যাদা নষ্ট হয়। আর একটা তুচ্ছ কারণ হইতে কথা বাড়িয়া এমন তুমুল কলহে পরিণত হইতে পারে, যে সেই মুখরা নারী-গুলির পরস্পর মিত্রভাব অপগত হওয়ায় একটা সামান্য মুহূর্ত্তেই সংসারের চিরদিনের গৌরবস্থল শান্তিময় একান্ন-বর্ত্তিত্বের বিলোপ ঘটা অসম্ভব হয় না।

বাক্সর্ব্বস্বা মুখরাগণের কোন গুণ থাকুক্ বা না থাকুক, 'বাক্যদ্বারা অন্যকে হারাইয়া

নিজের উৎকর্ষস্থাপন করিব', এইরূপ একটা জেদ স্বভাবতঃই তাহাদের মনে উদিত হইয়া থাকে। তাই তাহাদের উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রশমিত না হইয়া কবির লড়াইয়ের মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া নিজেদের ও সংসারের অনেক অবশ্য-গোপনীয় বিষয়গুলি এরূপ লঘুতার সহিত প্রকাশ করিতে থাকে, যে তাহাতে সংসারের সম্মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কতিপয়-পরিজন-দ্বারা গঠিত একান্নবর্ত্তী সংসারের অভ্যন্তরে নানা অভাব-অভিযোগ ক্রটী-বিচ্যুতি থাকিলেও বাহিরে সেগুলি অপ্রকাশিত রাখিয়া সাধারণের নিকট আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু এই লঘুচিত্তা মুখরাদিগের সহিষ্ণুতা এত অল্প যে, তাহাদের ইচ্ছার একটু অনুরূপ কার্য্য না হইলেই তাহারা ঢক্কারবে সংসারের সেই সেই ক্রটি-বিচ্যুতির ঘোষণা করিয়া এত আত্ম-পরিতৃপ্তি বোধ করে যে, তাহাতে যে তাহাদেরই গুহ্য কথাগুলি বাহির হইয়া লোকের নিকটে তাহাদেরই মুখ হেট করাইতেছে, ইহা তাহারা আদৌ বুঝিতে পারে না। সময়ে সময়ে তাহাদের সেই জেদ এত প্রবল হইয়া উঠে, যে তাহারা যদি একটা দোষ করিয়াও অন্যের দ্বারা তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলেও অপরের তিরস্কাররূপ আত্মপরাজয় সহ্য করিতে না পারিয়া তিরস্কার-কারিণীকে নিজের দোষের সমর্থনসূচক-বাক্য-পরম্পরা প্রয়োগদ্বারা পরাজয় করিতে গিয়া কেবল বারংবার নিজের দোষেরই উদ্ঘাটন করিয়া লোকের নিকট আরও দোষযুক্তা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। কিন্তু সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক নীরব হইয়া থাকিলে হয়ত তাহাদের সে দোষ তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ভৎসনাকারিনী ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিত না! আবার অন্য দিকে, দোষজ্ঞাপন-দ্বারা তাহাদের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া তাহাদের কর্ত্তৃক এবম্বিধ নির্য্যাতিত হওয়ায় আর কেহই, তাহারা কোন অনুচিত আচরণ করিলেও, কিছুই বলিতে সাহস করে না। ফলে, এইরূপে অপ্রতিহত বাক্য-প্রয়োগের প্রশ্রয় পাইয়া তাহারা ক্রমশঃ এতই আত্মম্ভরি হইয়া পড়ে, যে শেষে মনে করে, তাহারা যাহা করে সবই ভাল, তাহারা যাহা বলে সবই সত্য। তাহারাই কেবল জগতে খাঁটি ও তাহারাই জ্ঞানবতী, আর সকলেই অখাঁটি ও অজ্ঞান। এইরূপ আত্মভ্রান্তিতে তাহারা আর চরিত্রসংশোধনের অবসর না পাইয়া ক্রমশঃই দোষের কূপে নিমজ্জিত হইতে থাকে; এবং নিজের দুর্বিনীত-স্বভাবদ্বারা সকলেরই অপ্রিয় হইয়া অতিবিড়ম্বনাময় নিন্দিত জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের সম্পূর্ণ অনুগৃহীত ও আশ্রিত লোকেরাও তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহ উপস্থাপিত করে, এবং অনুগ্রহকে নির্য্যাতন মনে করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পলাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

এই মুখরাদিগের মনে সর্ব্বদাই বাক্যদ্বারা অপরকে জয় করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকায় ইহারা পরের বাক্য আদৌ সহ্য করিতে পারে না। যাহারা পরের বাক্য সহ্য করিতে পারে না, অপরে তাহাদের বাক্য সহ্য করিবে কেন? কাজে-কাজেই কলহ অবশ্যম্ভাবী। যেখানে অন্য কোন উপায় নাই, সেখানে এই সকল নির্য্যাতনকারিণী মুখরাদিগের তীব্রবাক্য

সহ্য করিয়া অন্তরে মরিয়া বাস করিতে হয় বটে, কিন্তু অন্য উপায় থাকিলে কেহই ইহাদের সংস্রবে থাকিতে চাহে না। এই জন্য এই মুখরাদিগের উৎপীড়নে সংসার ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ সকলেই মুখরাদিগের সংস্রব ত্যাগ করিতে যাওয়ায় সংসারের জমাট ভাব শিথিল হইয়া যায়। এই কারণেই আমরা একান্নবর্ত্তী সংসারে সহসা বৃদ্ধা জননীদিগের ৺কাশীবাসের ব্যবস্থা দেখিয়া চমকিত হই। কখন বা মুখরা পুত্রবধূদিগের পিত্রালয়-নির্ব্বাসনের প্রস্তাব শুনিয়া তাহাদের স্বকৃত দুরদৃষ্টের নিন্দা করিয়া থাকি। কখনও কখনও বা পুত্রের দারান্তর-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া একান্নবর্ত্তী সংসারটী বজায় রাখিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাই হউক্, এগুলি ত অশান্তিরই লক্ষণ, এবং মুখরতাদোষটাই ত ইহাদের জন্য একমাত্র দায়ী!

যখন একান্নবর্ত্তী সংসারটী কোনরূপে আর বজায় রাখা যায় না, অর্থাৎ মুখরতাদোষে পুত্রবধূগণ নিজ নিজ স্বামী ও সন্তানগুলি লইয়া ভিন্নরূপে বাস করিতে বাধ্য হয়, সে সময়ও তাহাদের মুখরতা প্রশান্তি লাভ করে না। তাহারা তখন আপনাদের মুখরতা-অস্ত্র হত-ভাগ্য স্বামীর উপর অহর্নিশ প্রয়োগ করিতে থাকে। যখন একান্নবর্ত্তী সংসারের মধ্যে ইহারা অবস্থিত ছিল, তখন ইহাদের মুখরতা বৃদ্ধা শ্বশ্রূ অথবা যাতৃগণের উপর প্রযুক্ত হও-য়ায়, স্বামীর উপর ততটা প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। বরং স্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত মুখরতা প্রকাশ করিবার সুবিধা হইত বলিয়া স্বামীর প্রতি ইহাদের একটু অনুগ্রহই দেখা যাইত। এক্ষণে সংসারের মধ্যে প্রধানভাবে অবস্থিত হইলেন আপনি ও স্বামী। সুতরাং নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে স্বামীকে জয় করিতে হইবে। জয় করিবার একমাত্র অস্ত্র তীব্রবাক্য-প্রয়োগ! কাজে-কাজেই স্বামীই এখন মুখরতাপ্রয়োগের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়েন। আর সন্তানগণকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীর প্রতি তীব্রবাক্য প্রয়োগের সুবিধা হয় বলিয়া, সন্তানগণ এখন একটু অনুকম্পার ভাজন হইয়া থাকে।

এইরূপ নারীরা যখন গৃহিণী হন তখন ইহাদের যত আক্রোশ পুত্র ও পুত্রবধূদিগের উপর পড়িয়া থাকে। পুত্র ও পুত্রবধূগণের সমধিক সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা থাকিলে, তাহারা নীরবে ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে সে সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা না থাকে, অধিকন্তু তাহারও যদি মুখরতাদোষের অধিকারী হয়, তাহা হইলে গৃহিণী যখন বৃদ্ধা, শক্তিহীনা এবং সম্পূর্ণরূপে পুত্রদিগের উপর নির্ভরশীলা হইয়া পড়েন, তখন যে তাঁহার ৺কাশীবাসরূপ নির্ব্বাসন-দণ্ডভোগ* করিতে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

অতএব দেখা যাইতেছে, কি শ্বশুরশ্বশ্রূর অধীন বধূ-অবস্থায়, কি স্বামীর অধীন গৃহিণী-অবস্থায়, কি পুত্রের অধীন বৃদ্ধাবস্থায়, সকল সময়েই নারীদিগের মুখরতা দোষ থাকিলে

---

* শুধু যে গৃহিণী ও বধূর মুখরতা-দোষে সর্ব্বত্র এইরূপ গৃহিণীর ৺কাশীবাসের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা নহে। অনেকস্থলে বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায়ও গৃহিণীগণ ৺কাশীবাস করিয়া থাকেন। এখানে '৺কাশীবাস' শব্দদ্বারা 'বাড়ী ও পুত্রবধূর' ভিন্নরূপে অবস্থান সূচিত হইতেছে মাত্র।

সংসারে অশান্তি উপস্থিত হয়। এই মুখরতা যে শুধু সংসারস্থ পরিজনবর্গের উপর পতিত হইয়া বহু অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে তাহা নহে, দাস-দাসী, প্রতিবেশী, অভ্যাগত প্রভৃতি সকলের উপর পতিত হইয়া অতি-বিষময় ফল প্রদান করে। মুখরা নারীর নির্য্যাতনে গৃহে দাসদাসী থাকিতে পারে না। ইহাতে নিজেদেরই পরিশ্রম বাড়িয়া যায়; আর প্রতিবেশিগণও মুখর ব্যবহারে শত্রুরূপে পরিণত হওয়াতে, তাহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এইরূপে পরসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া সংসার-পরিচালন সমধিক কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আর অভ্যাগতগণ তাহার তীব্রবাক্যে সন্তপ্ত হইয়া সংসারকে অভিশপ্ত করিয়া চলিয়া যায়।

মুখরতার এইরূপ কুফল দর্শন করিয়াই শাস্ত্রকারগণ পুরুষদিগকে মুখরা নারীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যে যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্র লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে মুখরা বা যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন, এরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না।

তাই বলি, যে-দেশের শাস্ত্রকারগণ নারী-গণকে দেবীত্ব প্রদান করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে শক্তির উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে দেশের মহিমময়ী নারীর সহিত অন্য কোন দেশের নারীর তুলনাই হয় না, যে-দেশের নারীদিগের পাতিব্রত্য আর কোন জাতির নারী অনুকরণ করিতে পারে নাই, যে-দেশের সাধ্বীকুলশিরোমণি শাস্ত্রকারগণের উপদিষ্ট

"পঞ্চবাণাপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুরেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥"—

এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে পালনপূর্ব্বক স্বামি-কর্ত্তৃক বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"*

যে দেশের নারীগণ সম্পদে বিপদে স্ব স্ব পতির সহচরী হইয়া প্রাণপণে তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতে বিরতা হয় না, যে দেশের নারীগণের লজ্জাময়ী কোমলপ্রকৃতি, নিঃস্বার্থ উদার ও মধুর ব্যবহার এবং প্রিয়বাদিতা সংসারের শান্তিপ্রস্রবণস্বরূপ, এবং যে দেশের নারীগণের আত্মসম্মান-জ্ঞান সমগ্র জগতের আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দেশের নারীগণের মধ্যে মুখরতার মত একটা গৌরবহানিকর জঘন্য দোষ থাকা যে সর্ব্বতো-ভাবে অনুচিত, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক জনক-জননীরই আপনাদের সদ্দৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষা-দ্বারা কন্যাগণ যাহাতে মুখরতা-দোষ প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে সংসারের অশান্তির কারণ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

* রামায়ণে সীতা-কর্ত্তৃক উক্ত।

নারী-মঙ্গল।

[রচনা——শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ]

জাগো, নারী-গৌরব মঙ্গলে জাগো ;
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

গৃহ-কারা-বন্দিনী স্বার্থের পণ্যা,
প্রমোদের সঙ্গিনী আভরণ-ধন্যা ;
অধিকার-বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

পুরুষের বন্দিনী পিঞ্জর-কক্ষে,
পরমনোরঞ্জিনী তৃষাতুর বক্ষে ;
প্রাণহীন অন্ধের বন্ধনে জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

কোথা বিধি বন্ধনে অন্তর সুপ্ত,
প্রভু-আঁখি-গঞ্জনে প্রাণধারা লুপ্ত ;
লাজ-অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

স্তনধারা-বঞ্চিত সন্তান-ধাত্রী,
চিরব্যাধি-সঙ্কিত দেহ দিবা রাত্রি ;
হেলা-ভয়-শঙ্কিতা কম্পিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

পায়ে পায়ে ধর্ম্মের শৃঙ্খল-বন্ধ,
যুগ যুগ মর্ম্মের তমসায় অন্ধ ;
দেহ-শোভা-সজ্জিতা লজ্জিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

জাগো দেবি বিশ্বের গৌরব-তীর্থে,
দীন হীন নিঃস্বের অবনিত চিত্তে ;
নিখিলের নন্দিতা বন্দিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।

[সুর ও স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

হরশৃঙ্গার——কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

II {ণা রা -া গমা। পা পা পা পা-া। ধা -পা মা গা:-া
(১) জা ০ গো ০ নারী গ উ র ব ম ঙ্ গ লে

রা। রা -মা মা -া I সা -া র্সা র্সা। না: ধ: পা -া
জা ০ গো ০ (২) বা ঙ্ লা র ভ গি নী ০

। রা -া ম: পা: । গা -মা মা -া } II
বা ঙ্ লা র মা ০ গো ০

ধূয়া ঃ—

	২´				৩				০			
I	সা	-া	র্সা	র্সা।	নাঃ	ধঃ	পা	-া।	রা	-া	মঃ	পাঃ।
	বা	ঙ্	লা	র	ভ	গি	নী	০	বা	ঙ্	লা	র

	১			
।	গা	-মা	মা	-া II
	মা	০	গো	০ ১০, ১৪, ১৮, ২২, এবং ২৬।

সোণার হার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মারাপ্পা ও দেবল দক্ষিণে চলিয়াছেন্। কাবেরীর বাম তীরে আসিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, কাবেরী উজ্জল রৌপ্যবাহু-দুইটী নিয়ে প্রসারিত করিয়া তরল আলিঙ্গনে শ্যামল কঠিন দ্বীপটিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জলপ্রপাতের শ্রবণভেদী গভীর কলরোল। উৰ্দ্ধে শরতের নীলাকাশ প্রবাহ-পাতোৎক্ষিপ্ত বাষ্পপুঞ্জে শ্বেতাভ হইয়া গিয়াছে। এইস্থান দাক্ষিণাত্যের পরমতীর্থ শিবসমুদ্রম্।

ক্রমে কয়েকটি যাত্রী আসিল। তুলামাস উপস্থিত; তাহারা তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। দীর্ঘজটা-ভূষিত গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত মারাপ্পার গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া তাহারা ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিল। তাহারা সেতুবন্ধ দর্শন করিতে যাইতেছে; সন্ন্যাসীকে সঙ্গিরূপে পাইয়া পরম পুলকিত হইল।

কাবেরী অতিক্রম করিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনের পর তাঁহারা মদুরায় আসিলেন। মারাপ্পা ও দেবল সুন্দরেশ্বরের মন্দির-সম্মুখে একটি উচ্চ গোপুরের * নিয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ অন্যস্থানে আশ্রয় লইল।

অপরাহ্ণে দেবল সংবাদ লইয়া আসিলেন, বাহমনী-সুলতানের সহিত বিজয়নগরের যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং বিবাহ পণ্ড হইয়াছে। সাম্রাজ্যের একপ্রান্তে রাজধানীর সংবাদ যাহা পৌঁছাইয়াছিল, তাহা অতিসামান্য। মারাপ্পা বিশেষ অনুসন্ধানেও অধিক কিছু জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাত্রিগণ অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া যখন মারাপ্পার নিকট আসিল, তাহারা শুনিল সন্ন্যাসী বিশেষ প্রয়োজনে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাহারা তখন ক্ষুণ্ণ-মনে বিশ্রাম-স্থানে চলিয়া-গেল।

* পুরদ্বার।

মারাপ্পা ফিরিলেন। তাঁহার মন যত দ্রুত চলিতে চাহিতেছিল, চরণ তত পারিতেছিল না। যে পথ দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন তাহা সহজ হইলেও দীর্ঘ। তিনি যে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু দুর্গম। শরতের শিশিরসিক্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, পাল্‌নী-পর্ব্বতের বন্ধুর শিলাপথ বাহিয়া পিতাপুত্র অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পিতার সহিত ভ্রমণ করিয়া দেবল এরূপ পর্য্যটনে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অমরাবতী-নদী উত্তীর্ণ হইবার পর এবার তিনিও মাঝে মাঝে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার বয়স অল্প—দেহ স্থূল না হইলেও মাংসল। মারাপ্পার বয়স অধিক হইলেও দেহ সুদৃঢ়, মাংসহীন। তিনি মানসিক উত্তেজনার আধিক্যে অগ্নিগর্ভ মধুপের ন্যায় অবলীলাক্রমে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, শ্রম গ্রাহ্য করিতে-ছিলেন না।

উভয়ে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যত প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই সকলের মুখে যুদ্ধের কথা শুনিতে পাইলেন। কোন স্থানে শুনিলেন বিজয়নগর সেনা বিজয়লাভ করিয়াছে এবং যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; কোন স্থানে শুনিলেন, সম্রাটের হস্তী মৈনাক নিহত হইয়াছে, সম্রাট্ বন্দী হইতেছিলেন, কিন্তু প্রধান নায়ক তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। গণ্ডীকোটা-রাজ্যের নিকটে আসিয়া তাঁহারা শুনিলেন, বৃদ্ধ গণ্ডীকোটা-সামন্ত যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন এবং সেইখানেই মুস্‌লম-অভিযানের প্রকৃত সংবাদ পাইলেন; যুদ্ধের কারণ শুনিয়া মারাপ্পা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু বৃদ্ধ সামন্তের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইলেন। শোক-প্রকাশের অবসর ছিল না। তিনি দেবলের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "দেবল, যত রাজধানীর নিকটে যাইতেছি ততই মনে হইতেছে, প্রজাগণ এ যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয় নাই,—যেন কে ইহাদের মধ্যে বিষম অসন্তোষের বীজ-বপন করিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বাধিয়াছে অথচ দক্ষিণ হইতে সেরূপ সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সমরক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে না কেন?" দেবল বলিলেন, "অসন্তোষের চিহ্ন আমি কিছু লক্ষ্য করিতে পারি নাই। সৈন্য যাহারা যাইবার, গিয়াছে।" পরক্ষণেই আবার তিনি বলিলেন, "যদি বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া থাকেন, আদেশ দিন, অশ্বা-রোহণে এইটুকু পথ অতিক্রম করিব। আপনার জন্য শিবিকার ব্যবস্থা হইতে পারে। মারাপ্পা মস্তক মৃদু আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "শিবিকা কি শীঘ্র যাইবে, দেবল? অশ্ব বা শিবিকা আর ব্যবহার করিব না। দেবল! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ?" তাঁহার স্বরে অনুকম্পা বা সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না—তাহাতে যেন ক্রোধ ও বিরক্তি ঈষৎ মিশ্রিত ছিল, যেন দেবলের অবসাদ-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দেবল গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

দেবল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ক্লান্ত হইয়াছি বলিয়া ওকথা বলি নাই। অশ্বা-রোহণে যাইলে শীঘ্র যাইতে পারিতাম। রাজধানীতে যাইবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। মারাপ্পা অন্যমনস্কভাবে শুধু বলি-লেন, "না, একসঙ্গেই যাইব।"

চলিতে চলিতে তাঁহারা একটি গণ্ডগ্রামে পৌছিলেন; সেখানে অধিকাংশ লোক

মারাপ্পাকে চিনিত। তাহারা মারাপ্পাকে যেন কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করে না। তাহারা পথিক-দুইজনকে দুইটি পাত্র ভরিয়া দুগ্ধ আনিয়া দিল। পিতাপুত্রে গ্রাম-সংলগ্ন মন্দিরের বহির্দ্বারে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মারাপ্পা দেখিলেন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, ভাবিলেন এইস্থানে অবস্থান করিলে গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে নূতন সংবাদ দিতে পারিবে। ক্রমে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। দেবলকে নিদ্রা যাইবার আদেশ দিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

হঠাৎ একটি ক্রুদ্ধ চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শুনিলেন, দেবল গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন"—রাজার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিব। এত বড় স্পর্দ্ধা ?" ধনুকের জ্যা ছিন্ন হইলে বক্র কোদণ্ড যেমন সহসা সরল হয়, মারাপ্পা সেইরূপ ভূমিত্যাগ করিয়া একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখিলেন, অনতিদূরে দেবল কতিপয় গ্রামবাসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মারাপ্পা তীব্রস্বরে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! এত শীঘ্র রাজদ্রোহী হইলে ?" মারাপ্পার কথা শুনিয়া গ্রামবাসী-কয়জন পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। পিতাকে জাগরিত দেখিয়া দেবল কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "রাজধানীতে বিদ্রোহ হইয়াছে। একজন ভণ্ড প্রতারক নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।" মারাপ্পার আর একবার চমক্ ভাঙ্গিল।

মারাপ্পার আদেশে প্রাচীন গ্রামবাসী-কয়জন কম্পিতকলেবরে সমস্ত সম্বাদ নিবেদন করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর উত্তর হইতে একব্যক্তি কয়েকটি অনুচরের সহিত আসিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছিল যে, সম্রাট্ প্রেমের কুহকে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইয়াছেন ; লোকাচার্য্যদেব সম্রাট্‌কে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ; প্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি শাপ দিয়া গিয়াছেন—যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় হইবে ও বুক্কের একজন বংশধর নূতন সম্রাট্ হইয়া মুসলমানের গতিরোধ করিবেন ; সম্রাটের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মারাপ্পা স্বয়ং পুত্রের সহিত রাজধানী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন ; সম্রাট্ এবার মহানবমীর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন না,—উৎসবে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সমারোহও ছিল না ;—এইরূপ শ্রীহীন উৎসব সাম্রাজ্যের অকল্যাণকর। যে আগন্তুক এই সকল সংবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তিনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বীরবিজয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে বাহমনী-সুলতানের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি নিহত হ'ন নাই ; একজন সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে জীবন পাইয়াছিলেন। এতদিন সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি নিভৃত গুহায় জীবনযাপন করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর মৃত্যুকালীন আজ্ঞায় তিনি সাম্রাজ্যকে পাপ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবার সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন।

গ্রামবাসিগণ সসঙ্কোচে সংশয়-কম্পিতস্বরে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল। অনেকবার ভয়ে তাহাদিগের কথা অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। মারাপ্পা নিবিষ্টচিত্তে ইহা শুনিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানী-ত্যাগের কারণ তাহাদিগের মুখে যেরূপ শুনিলেন তাহাতে অন্যসময় হইলে আমোদ অনুভব করিতেন, কিন্তু এখন তাহার মধ্যে কেবল ষড়যন্ত্রকারি-

গণের কূটবুদ্ধির পরিচয় পাইলেন। যখন তিনি শুনিলেন, প্রতারক আপনাকে তাঁহারই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা ছিল না। কিন্তু অসীম মানসিক বলে সে ক্রোধ দমন করিলেন। দেবল পিতার শান্তভাব দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। মারাপ্পার ভাব দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বুঝিতে পারিল না, তিনি তুষ্ট হইয়াছেন কি রুষ্ঠ হইয়াছেন। ভীরু দুর্ব্বলচেতা বলিয়া তাহারা সে নীরবতাকে অসন্তোষের চিহ্ন বলিয়াই ধারণা করিল এবং আপনাদিগের দোষস্খালনের জন্য বলিল যে, তাহারা এ-সব বিষয়ে কিছুই জানে না, তাহাদের অঞ্চলে কোন গোলযোগ হয় নাই, কেবল কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক নূতন সম্রাটের সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার জন্য গ্রামত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মারাপ্পা সহসা বলিলেন, "নূতন সম্রাট্ যে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র তাহা ঠিক্ জানিতে পারিয়াছ?" তাহারা বলিল, 'আমরা সে রাজপুত্রকে ত' পূর্ব্বে দেখি নাই। তবে অনেকে এ সম্রাটের দেহে একটি বহুদিনের অস্ত্রের আঘাত দেখিয়াছে। তাহারাই বলিতেছে, ইনি সেই রাজপুত্র।" মারাপ্পার আর কিছু জানিবার ছিল না, রাত্রিও গভীর হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার পূর্ব্বে তাহারা অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ দিতে যাইতেছিল; মারাপ্পা নিষেধ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায়, কেবল কয়েক খণ্ড জলন্ত অঙ্গার নিষ্ফল ব্যথায় আপনারাই ভস্মীভূত হইতেছিল। পিতার তূষ্ণীম্ভাব দেখিয়া দেবল বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে বিস্ময় চরম সীমায় পৌছাইল যখন পিতা তাঁহাকে শয়ন করিতে আদেশ দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। তিনি পিতার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। বাল্যকাল হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে পিতার নিকট হইতে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা করা দুরাশা-মাত্র। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না।

মারাপ্পাও জাগরিত ছিলেন। শত চিন্তা যুগপৎ উত্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিতেছিল। ইহা যে একটি প্রবল ষড়যন্ত্র, সে-বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মুদ্‌কল-অভিযানের ফলে বাহমনী-সুলতানের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু লোকাচার্য্যের নির্ব্বাসন সংবাদও কি সত্য? সে ব্রাহ্মণ বংশের নিকট বুক্কের বংশ যে অশেষপ্রকারে ঋণী! এ বিদ্রোহ কি সেই কৃতঘ্নতা-পাপের শাস্তি? এ সংবাদ নিশ্চয় অমূলক। কোন অজ্ঞাত-কারণে তিনি হয় ত রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংবাদ-রাজধানীতে বিপ্লব। বুক্কের বংশধরের হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছে। রাজ-পরিবারবর্গের অদৃষ্টে কি ঘটিতেছে কে বলিবে?

গভীর নিশীথে মারাপ্পা দেবলকে ডাকিলেন। দেবল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "তুমি নিদ্রা যাও নাই?" দেবল বলিলেন, "নিদ্রা হইল না।"

মারাপ্পা বলিলেন, "চল অগ্রসর হই।" দেবল বলিলেন, "অপরাধ ক্ষমা করুন, আদেশ দিলে এখনও অশ্বের ব্যবস্থা করিতে পারি।" মারাপ্পা দেবলকে বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, অশ্ব কি করিব?" দেবল আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "এই বিষম বিপদের সময় প্রথম ও শেষবার নিয়মভঙ্গ করুন, তাহাতে ধর্ম্মলঙ্ঘন হইবে না।" চলিতে চলিতে মারাপ্পা বলিলেন, "তুমি দেবরায়ের জন্য চিন্তিত হইয়াছ?" সম্মুখে বাধা পাইয়া দেবের পড়িবার উপক্রম হইল। মারাপ্পা তাহা দেখিতে পাইলেন না। দেবল বলিলেন, "মূর্ত্তিমূর্ত্ত বারিব ন্যায় রাজ্যের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সরিয়া যাইতেছেন, এ-সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারিলে ভ্রাতার সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য দেহের যত শোণিত নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে পারিতাম।" মারাপ্পা স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া যেন পথ-পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "দেবল! আমার মত সন্ন্যাসী হও, রাজ্যের পরিণাম দেখিতেছ ত'!" দেবলের মুখের বাধা আজ সরিয়া গিয়াছে; তিনি বলিলেন, "আজ পরশুরামের ন্যায় সন্ন্যাসীর অস্ত্রধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন সন্ন্যাসের কথা তুলিতেছেন কেন? পরিণামের এখনও বোধ হয় বিলম্ব আছে। একবার রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারিলে দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিতে পারিতাম।" মারাপ্পা বলিলেন, "রাজধানীর অভিমুখেই ত' যাইতেছি, দেবল!" মারাপ্পার স্বরে যে কোমলতা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেন না। দেবলের কর্ণে সে স্বর সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। তিনি পুলকিত হইলেন, সেই সঙ্গে আপনার রূঢ়তার জন্য লজ্জিতও হইলে।

স্থানটি নির্জ্জন, একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা। বৃহৎ, নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মারাপ্পা একটি প্রস্তর-খণ্ডের পার্শ্বে উপবেশন করিতে মনঃস্থ করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা পশ্চাতে অশ্বের দ্রুত আগমন-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। উভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন কয়েকজন সৈন্য অশ্বারোহণে সেই দিকে আসিতেছে। পিতাপুত্র প্রস্তরখণ্ডে পৃষ্ঠ-রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মারাপ্পা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেবল! ইহারা বিজয়নগর-সেনা দেখিতেছি। আক্রান্ত না হইয়া ইহাদের উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করিও না।"

সৈন্যদের নেতার অঙ্গের বহুমূল্য পরিচ্ছদ পথধূলিতে মলিন হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য সৈন্যগণ কিছু দূরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মারাপ্পাকে অভিবাদন করিল। নেতা অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমরা বিজয়নগর-সম্রাট্ বীর বিজয়ের আদেশে আপনাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাইব।"

মারাপ্পা সংযতভাবে বলিলেন, "আমরা রাজধানীর অভিমুখেই যাইতেছি।" নেতা বলিল, "আমার দুইজন সৈন্য এখানে অপেক্ষা করিবে, আপনাদিগকে তাহাদের অশ্বে উঠিতে হইবে।" মারাপ্পা অঙ্গারতুল্য চক্ষুর্দ্বয় সৈনিকের বদনোপরি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "যদি আমরা আরোহণ না করি?" সৈনিক সে

দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া বদন অবনত করিল এবং তৎপরে বলিল, "আপনারা এখন বন্দী; আমার আজ্ঞানুসারে আপনাদের চলিতে হইবে!" মারাপ্পার চক্ষু জ্বলিতেছিল, কিন্তু স্বর অকম্পিত। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দেবল! অধৈর্য্য হইও না!" পরে সৈনিকের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমি বিজয়নগর-সম্রাটের পিতৃব্য। আমাকে বন্দী করিবার কথা বিজয়নগরের কোন সৈনিকের মুখ হইতে বাহির হইবে না। তুমি নিশ্চয়ই বিদেশীয়। তুমি তৈলঙ্গের অধিবাসী!" শেষের বাক্যগুলি একটি একটি করিয়া মারাপ্পার ওষ্ঠ হইতে নির্গত হইল। সৈনিকের মুখ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পাংশু হইয়া গেল; সে আত্ম-সংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আপনার অধীন সৈন্যগণকে উভয়কে বন্দী করিবার আদেশ দিল। তাহারা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এ দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল এবং এই আদেশ-পালনে কোনরূপ আগ্রহ না দেখাইয়া বলিল যে, স্বয়ং সম্রাট্ আদেশ দিলেও তাহারা তাহা পালন করিত না। মারাপ্পার শীর্ণ ওষ্ঠে একটি বক্র হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই মিলাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "সৈনিক! বিজয়নগরে ফিরিয়া যাও। যদি এখন হইতে সাবধান না হও, রাজধানীতে পুনরায় দেখা হইবে।" উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈনিক অশ্ব-চালনা করিল।

সৈন্যগণ প্রথমে নেতার অনুগমন করিতে চাহিল না। মারাপ্পা পুনঃ পুনঃ যাইতে বলিলে তাহারা অবশেষে উত্তর দিল, তাহারা শ্রান্ত, বিশ্রামান্তে চলিয়া যাইবে। তাহাদের নিকট হইতে মারাপ্পা যুদ্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু কিছু অবগত হইলেন। তুঙ্গভদ্রাতীরে বিজয়নগর-সেনার তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে তাহারা বলিতে পারিল না; তবে দেবরায় যে জীবিত ও নিরাপদ্ সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহারা আরও বলিল যে রাজ-পরিবারবর্গ আনিগণ্ডী-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। মারাপ্পার কন্যা দুর্গা স্বয়ং রাজপুরীরক্ষী সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নূতন সম্রাট্‌কে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিল। যখন রক্ষিগণ যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল, বালিকা পুরনারী-গণের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া শিবিকা-রোহণে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মধুরাওয়ের কন্যার সহিত আনিগণ্ডীতে প্রস্থান করিলেন; কেহ তাঁহাদিগের গতিরোধ করে নাই। নূতন সম্রাট্ আনিগণ্ডীর দুর্গ-রক্ষককে দুর্গসমর্পণের আজ্ঞা দিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছেন যে, মারাপ্পা রাজধানীতে আগমন না করিলে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিবেন না।

মারাপ্পার আর একটি দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। ক্রমে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ সেখানে সমবেত হইল। মারাপ্পার পশ্চাতে সশস্ত্র-সৈন্যের অভিযান দেখিয়া তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল, এখন মারাপ্পাকে নিরাপদ্ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। মারাপ্পা সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন। গ্রামবাসী যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা মারাপ্পার সহিত বিজয়-নগরে যাইতে চাহিল। মারাপ্পা তাহাদিগকে সে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু তথাপি তাহার পরবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন না করিয়া নিবৃত্ত হইল না।

যখন পিতাপুত্র নির্জ্জনে কথা কহিবার

৭৪৮

অগ্রসর পাইলেন, তখন দেবল বলিলেন, "এই স্থান হইতে কয়েক সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলে আমাদের উদ্দেশ্য, বোধ হয়, শীঘ্র সাধিত হইত।" দেবলের সঙ্কোচ কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। মারাপ্পা দেবলের বাক্যে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "দেবল! আমরা যদি সসৈন্যে অগ্রসর হই, দুর্বৃত্তেরা ঘোষণা করিবে যে মারাপ্পার সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রতারণা-মাত্র, সে উচ্চাশার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যলোভে রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ফলে অনর্থক রক্তপাত হইবে, এমন কি তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে।" উত্তর শুনিয়া দেবল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পিতাকে আর পরামর্শ দিতে যাইবেন না।

তাহার পর প্রত্যেক স্থানে মারাপ্পা বিজয়ী রাজেশ্বরের ন্যায় অভ্যর্থনা পাইতে লাগিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমরা আপনার সহিত রাজধানী যাইতে চাহি।" মারাপ্পা তাহাদের সাহায্য লইলেন না। ষড়যন্ত্রিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন সৈন্যই মারাপ্পার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে স্বীকৃত হইল না। দুর্বৃত্তগণের শেষ আশা, যদি মুসলমানসৈন্য শেষ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়। তাহারা বাহমনী-সুলতানের নিকট সংগোপনে দূত প্রেরণ করিয়াছিল ; কিন্তু সে সাহায্য পৌঁছিল না।

বিজয়-নগরের দক্ষিণ তোরণের প্রহরী সেনা মারাপ্পাকে দেখিয়া সসম্মানে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। পুরস্কারের লোভ, অনুনয়, ভয়-প্রদর্শন সব বিফল হইল দেখিয়া নূতন সম্রাটের সঙ্গিগণ প্রাসাদে পলায়ন করিল। মারাপ্পা বিজয়নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিশাল জনসঙ্ঘ প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। মারাপ্পা তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। সে আদেশ অমান্য করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হইলেও কেহ তাহা অমান্য করিতে সাহস করিল না। নির্ম্মম দণ্ডধারী কালের ন্যায় ধূলি-ধূসরিত-গৈরিক-বসন সন্ন্যাসী প্রাসাদ-দ্বারে উপনীত হইলেন। মস্তকের দীর্ঘ পিঙ্গল জটাজাল ভয়ঙ্কর ধূমকেতুর পুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

প্রাসাদ-রক্ষিগণ নতজানু হইয়া মারাপ্পাকে বলিল, "সম্রাটের অনুমতি লইয়া আসি ;—আপনি অপরাধ না লইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন।" মারাপ্পা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "কে সম্রাট্? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র জীবিত নাই। আমি স্বহস্তে তাহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া দিয়াছিলাম। তোমরা মূর্খ, তাই একজন ভণ্ড বিদ্রোহীকে বিশ্বাস করিয়াছ।" নূতন সম্রাটের অনুচর-কয়জন রক্ষিগণকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া উত্তেজিত করিতে আসিয়াছিল। প্রতারণা-জাল ছিন্ন হইল দেখিয়া তাহারা ইতস্ততঃ পলায়নের চেষ্টা করিল। পলায়নের সুযোগও ছিল ; কারণ, রক্ষিগণ মারাপ্পা ও দেবলের পশ্চাতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। মারাপ্পা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রাসাদ-দ্বার অরক্ষিত রাখিতে নিষেধ করিলেন এবং শুধু দেবলকে লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুরীর এক নিভৃত কক্ষে দুর্বৃত্তগণ আশ্রয় লইয়াছিল। একজন ভৃত্য সে কক্ষ দেখাইয়া দিল। মারাপ্পা দেখিলেন, ভণ্ড

বীরবিজয়ের সহিত তাঁহার মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের এমন কোন সাদৃশ্য নাই যাহাতে লোক প্রতারিত হইতে পারে। . যুবা অস্ত্রবদ্ধ, তাহার সন্ন্যাসি-বেশের উপর রাজালঙ্কার, বদনে শঙ্কার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বে আর একটি মূর্ত্তি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই দক্ষিণে মারাপ্পাকে বন্দী করিতে চাহিয়াছিল। তাহার চক্ষে একটি হিংস্রভাব, যেন বন্যপশু পলায়নের উপায় না দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মারাপ্পা তীব্রস্বরে বলিলেন, "মিথ্যাবাদী কাপুরুষ। যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া ঘৃণিত প্রাণ রক্ষা কর। গৈরিক-বেশের অন্তরালে থাকিলে লোকে তোমার এ আচরণ হয় ত ভুলিয়া যাইবে। দূর পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় থাকিয়া আপনার অকীর্ত্তি গুপ্ত করিয়া রাখ, নচেৎ ঐ বন্যপশুর সহিত তোমার বাসভূমি তৈলিঙ্গে পলায়ন কর।"

"রক্ষা করুন্! আমি অপরাধী"! বলিয়া যুবক মারাপ্পার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে অন্যদিকে যুবার দুইটি অনুচর উপস্থিত হইল। কক্ষে অপর যে ব্যক্তি ছিল সে অস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কাপুরুষ! এক বৃদ্ধের ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিবে!" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল, তাহার পশ্চাতে অন্য দুইজন যোগদান করিল। কেবল তরবারি নিষ্কাসিত করিতেছিলেন, কিন্তু মারাপ্পা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "জীবনে আর অস্ত্র ধরিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই তোমার শাস্তি।" বলিতে বলিতে তিনি চক্ষুর নিমিষে হস্তধৃত কমণ্ডলু তাহার মস্তকে নিঃক্ষেপ করিলেন। সে দারুণ আঘাতে হতভাগ্যের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

আমাদের খাদ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

খাদ্য-নির্ব্বাচন।— প্রধানতঃ দুইটী কারণে আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ, এঞ্জিন চালাইবার জন্য যেরূপ কয়লার প্রয়োজন, সেইরূপ আমাদের শরীর চালাইবার জন্য ইন্ধন-জাতীয় আহারের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের ক্ষয়-নিবারণের জন্য পুষ্টি-কর আহারের প্রয়োজন। এই দুই প্রকারের গুণানুসারে আহারকে নিম্নলিখিত-ভাবে শ্রেণী-বদ্ধ করা যাইতে পারে।—

শরীরের শক্তি-রক্ষার ও চালনার জন্য অগ্নিবর্দ্ধক (ইন্ধন-জাতীয়) খাদ্য (শ্বেতসার-বিশিষ্ট খাদ্য)।

১। Tapioca (সাগু দানা-জাতীয় খাদ্য)
২। সাগুদানা
৩। চাউল
৪। ভুট্টার ময়দা
৫। যব
৬। macaroni
৭। মকাই
৮। যৈ-চূর্ণ (oat meals)
৯। রুটী
১০। কড়াই শুঁটী

১১। আলু   ১৪। গাজর
১২। কলা   ১৫। সালগম
১৩। পার্শনিপ

(চিনি-বিশিষ্ট খাদ্য)

১। চিনি   ৫। খেজুর
২। মধু   ৬। Prunes
৩। গুড়   ৭। মিষ্ট আচার (jam)
৪। কিস্‌মিস্   ৮। শুষ্ক ফল

(তৈল-বিশিষ্ট খাদ্য)

১। ওলিভ তৈল   ৫। গাঢ় দুগ্ধের সর
২। চর্ব্বি   ৬। suet
৩। মাখন   ৭। শূকরের মাংস
৪। মার্জ্জারিন   ৮। ডিম্বের হরিদ্রা

শরীরের বৃদ্ধিকারী ও ক্ষয়-নিবারক খাদ্য।

(প্রোটীন-বিশিষ্ট খাদ্য)

১। পনির (cheese)   ৬। শূকরের মাংস
২। মৎস্য   ৭। বাদাম-জাতীয়
৩। সীম, মটর, মুসুর   ৮। যৈ-চূর্ণ (oat meals)
৪। গোমাংস   ৯। macaroni
৫। মেষ-মাংস

(খনিজ-পদার্থ-বিশিষ্ট)

১। ওলিভ   ৯। দুগ্ধ
২। শুষ্ক ডাইল   ১০। গাজর
৩। Curly kale   ১১। বীট
৪। Water cress   ১২। Lettuce
৫। শুষ্ক ফল   ১৩। celery
৬। spinach   ১৪। পিঁয়াজ
৭। বাঁধাকপি   ১৫। সমস্ত টাট্‌কা ফল
৮। পার্শনিপ

উপরি-উক্ত আহার্য্য-সমূহের সামঞ্জস্য ও মিশ্রণই প্রয়োজনীয় আহারের উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন।

ভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আহার কি পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন, তাহা নিম্নলিখিত রুটীর পরিমাণ হইতে নির্দ্ধারিত হইবে।

একখানি প্রমাণ রুটীর ওজন ২ পাউণ্ড অথবা একসের। ইহার মূল্য ।০ আনা হইতে ।৵০ আনার মধ্যে। ৪ আউন্স অথবা ১০ তোলা বা অর্দ্ধ পোয়া রুটী আমাদের দেশের ৭॥ তোলা ভাতের সমান। আমাদের বাঙ্গলা-দেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশে রুটীই প্রধান খাদ্য ; সেজন্য রুটীর পরিমাণই এখানে প্রদত্ত হইল।—

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কিংবা কোন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত গুরু-পরিশ্রমী স্ত্রীলোকের দৈনিক আহার-পরিমাণ ১১॥ আউন্স রুটী (দেড় পোয়া)। গৃহকার্য্য কিংবা সাধারণ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের আহারের পরিমাণ ৯ আউন্স রুটী। কোনরূপ পরিশ্রমশীল কার্য্যে নিরত অথবা একস্থানে বসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের আহারের পরিমাণ ৮ আউন্স রুটী।

কোন প্রকার পরিশ্রমশীল কার্য্যে নিরত অথবা একস্থানে বসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত পুরুষের আহারের পরিমাণ ১০ আউন্স রুটী।

সাধারণ শিল্পকার্য্য কিংবা অন্যান্য সহজ কার্য্যে নিযুক্ত পুরুষের আহারের পরিমাণ ১ পাউণ্ড রুটী।

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কিংবা অন্যান্য পরিশ্রম-শীল কার্য্যে নিযুক্ত একজন পরিশ্রমী পুরুষের দৈনিক আহারের পরিমাণ ১ পাউণ্ড ২ আউন্স রুটী।

সাধারণতঃ দিনে চারিবার আহারের ব্যবস্থা। উপরি উক্ত রুটীর পরিমাণ হইতে একজন সাধারণ শ্রমশীল ব্যক্তির একবারের আহারের পরিমাণ ৪ আউন্স অথবা ১০

তোলা রুটী নির্দ্ধারিত করা হয়। প্রায় সিকি ইঞ্চ পরিমাণ রুটীর সুইস টুক্‌রা কাটিলে প্রত্যেক টুক্‌রা প্রায় এক আউন্স হয় এবং সেই অনুসারে প্রতিবারে চারি টুক্‌রা একবারের আহারের পক্ষে যথেষ্ট। রুটীর সঙ্গে অন্যান্য আহার্য্য যুক্ত হইলে, রুটীর পরিমাণ সেই অনুসারে কমান বিধেয়।

এই ৪ আউন্স রুটীর সমতুল-শক্তি-বর্দ্ধন-গুণ-বিশিষ্ট অন্যান্য আহার্য্যের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্বেতসার-বিশিষ্ট

১।	আলু—১২॥	আউন্স
২।	চিনি—২৮	"
৩।	পরিষ্কৃত গুড়—৩৵০	"
৪।	বৈ-চূর্ণ—২॥	"
৫।	চাউল—৩	"
৬।	আপেল—১৭৵০	"
৭।	বড় সীমের বীচি—৩৵০	আউন্স
৮।	Tapioca সাগু-জাতীয়—৩	"
৯।	আক্‌রোট—১।৵০	"
১০।	মুসুর ডাল—৩৵০	"
১১।	macaroni—৩৵০	"

তৈল-বিশিষ্ট

১।	দুগ্ধ—১৫।০	আউন্স
২।	মুরগীর ডিম—৬৵০ (৩৪টী)	"
৩।	পনির—২॥	আউন্স
৪।	মাখম—১॥	"
৫।	তৈলীয় মৎস্য—৭॥	"
৬।	রোহিত জাতীয়—৫।	"
৭।	শূকরের মাংস—২	"
৮।	ভেড়ার মাংস—৩॥	"
৯।	মুরগীর মাংস—৭	"
১০।	গোমাংস—৪	"

উপদেশের ঝুড়ি।

আমাদের শোবার ঘর আর একটা দোকানে কিছু তফাৎ নেই। দোকানে যেমন ছবি, আয়না, আলমারী, কাচের ও মাটীর পুতুল থাকে, আমাদের ঘরেও সেই রকম নানা রকমের জিনিষ থাকে; অধিকন্তু সিন্দুক, পেটরা, খাট, বিছানা, বালিশও থাকে। দোকানদার তার দোকান সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে; কারণ, অগোছাল দোকানদারের কাছে খদ্দের আসে না। আমাদের ঘরের কোন বালাই নেই। যিনি এ-ঘরে শুতে না আস্‌বেন, তাঁর গাছ-তলাতে বসতি করতে হবে।

শোবার ঘরে বাজে জিনিশ না রাখাই ভাল। শোবার ঘরে বেশী জিনিশ থাক্‌লে, হাওয়ার ভাগ কমে যায়। একে ত' খুব গরম না পড়লে আমরা জানালা খুলে রাখি নে; তার ওপর এত জিনিশ ঘরে থাক্‌লে, ঘর অন্ধকূপ হয়। কাপড়, চোপড়, দরকারী বা দামী জিনিশ একটা সিন্দুক বা আলমারীতে রেখে অন্য যা' কিছু আস্‌বাব্-পত্র অন্য একটা ঘরে বিদেয় করে দেওয়া উচিত।

সকলের বাড়ীতেই দু'একখানা পট দেওয়ালে থাকে, এবং তা' রাখাও উচিত। খালি সাদা দেওয়ালের উপর ছবির আগে

পড়্‌লে এমন ঝক্‌মক্‌ করে যে তা'তে চোখের অনিষ্ট হয়। ঘরের দেওয়ালে পট টাঙ্গান থাকলে চোখের আরাম হয়। তবে পটগুলি সাজিয়ে রাখা দরকার। এখানে একখানা, সেখানে একখানা; একখানা বেঁকা হয়ে রয়েছে, একখানার কাঁচ ভাঙ্গা, কোন খানার ওপর মাকড়সার বাসা, পেছনে মাকড়সার জাল ;—এ রকম ছবি দেখ্‌লে মন ভাল হয় না। ছবিগুলি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া কর্‌তে হয়। এক দেওয়ালের ছবি আর এক দেওয়ালে, এক ঘরের ছবি আর এক ঘরে নিয়ে গেলে ছবির পেছনে ধুলো, মাকড়সার জাল জম্‌তে পায় না, আর দেওয়ালগুলিও নতুন নতুন দেখায়। যাঁদের পক্ষে মাসে মাসে নতুন ছবি কেনা সম্ভব নয়, তাঁরা এ পরিশ্রমটুকু কর্‌লে নূতন ছবি কেনার কাজ হয়।

ঘরের মেঝেতে রোজই ঝাঁট পড়ে, কিন্তু খাট, আলমারীর তলে বা ঘরের মধ্যে কানিশের ওপর ধুলো জমে থাকে। তা' পরিষ্কার না কর্‌লে মশা-মাকড়সা প্রভৃতি জন্মায়। বছরের মধ্যে একবার ঘরে চুণকাম কর্‌লে মশা-পোকা-মাকড়ের উৎপাত হ'তে অনেকটা রক্ষে পাওয়া যায়।

সম্ভব হ'লে বিছানাগুলি রোজ রোদে দেওয়া উচিত। আর ২।৪ দিন অন্তর বালিশের ওয়াড় ও চাদর জলকাচা করা উচিত। গ্রীষ্মকালে ঘামে ভিজে বিছানা-পত্রে দুর্গন্ধ হয়, সেইজন্ত বালিশ-কাঁথা রোদে দেওয়া ও ওয়াড়-চাদর কেচে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এ-রকম কর্‌লে অনেক সময় ছারপোকার উপদ্রবও কমে।

ছারপোকা রক্তবীজের জাত। তাদের ধ্বংস করা সোজা ব্যাপার নয়। মশা-ছারপোকা একজনের রোগ আর একজনের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। মশারী খাটালে মশার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ছারপোকাকে এত সহজে আট্‌কান যায় না। ছারপোকা-ধ্বংস করার একমাত্র উপায় খাট-চৌকি গরম জলে ধুয়ে দেওয়া। খাটের উপরে চিনি দিয়ে রাখ্‌লে চিনির লোভে পিপ্‌ড়ে ছারপোকার রাজ্যে উপস্থিত হয়। পিপড়ে বড় ছারপোকার বিশেষ অনিষ্ট করতে পারে বলে বোধ হয় না, কিন্তু তাদের ডিমগুলি নষ্ট করে, তা'দের নির্ব্বংশ কর্‌তে পারে। ছারপোকা যে শুধু খাট-বিছানায় থাকে তা' নয় ; দেওয়ালে পেরেকের গর্ত্ত বা ফাটল থাক্‌লে সেখানেও আশ্রয় নেয়। সেইজন্ত এক একবার ঘরে কলি ফেরান উচিত। একবাড়ী হ'তে আর এক বাড়ী বা এক জায়গা হ'তে আর এক জায়গায় ছার-পোকা গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বইএর মধ্যে, হাত-পাখার সঙ্গে, ট্রেণে চড়ে যাবার সময় কাপড়-জামার মধ্যে ছারপোকা ওঠে। সুতরাং একবার ছারপোকা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা চলে না। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করার দরকার।

ছারপোকা নষ্ট কর্‌বার সময় স্বার্থপর হ'লে চলে না। নিজের ঘরের ছারপোকা নষ্ট করা হ'ল, কিন্তু ছোট বৌয়ের ঘরের ছারপোকা থেকে গেল। হয় নিজে দু'ঘরের ছারপোকা মার্‌তে হ'বে, না হয় ছোট বৌয়ের সঙ্গে ভাব করে দু'জনে এক সঙ্গে কাজ কর্‌তে হবে ; নচেৎ ঐ ছোট্ট জানোয়ারটি ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে 'ছোট' ঘর থেকে বড় বা মেজ ঘরে আস্‌বে।

উপহার।

মনে নাই, কত দিন— কত বর্ষ আগে
কবে গেঁথেছিনু হায় বিরলে বসিয়া ;
আশায় কুসুমগুলি অরুণের রাগে
ফুটেছিল কোন্ যুগে সুষমা ঢালিয়া !

তারপরে কেটে গেছে কতগুলি দিন—
স্মরণের ইতিহাসে রাখি নি লিখিয়া,
আজানা বিষাদে কবে হৃদয়ের বীণ
জানি না, ঢেলেছে অশ্রু ব্যথায় গলিয়া !

বসন্ত-প্রভাতে আজি দেখিনু সহসা
অযত্ন-মলিন সেই শুষ্ক ফুল-হার,
হাসি-প্রীতি-অশ্রু আর কামনা-লালসা
সকলি শিথিল— ছিল যত উপচার।

ঝরে গেছে দলগুলি, বোঁটাটুকু সার,
লও প্রিয়তম আজি দীন উপহার।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

হারল্ডের মৃত্যুর পর হইতে ইংলণ্ডে বৈদেশিকগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রথমে দুইজাতির মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু প্রথম নর্ম্মান্ নৃপতির কনিষ্ঠ পুত্র যখন অ্যাল্‌ফ্রেডের বংশের এক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তখন দুইজাতির মধ্যে মিলন-বন্ধন-স্থাপনের সূত্রপাত হইল। গর্ব্বিত নর্ম্মান্ সামন্তগণ উপহাস করিয়া রাজা-রাণীর ব্যঙ্গ নামকরণ করিলেন ; কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডের স্যাক্‌সন্ অধিবাসীগণের উল্লাসের সীমা ছিল না।

পরবর্ত্তী রাজগণ এ-প্রথা পালন করেন নাই। প্রথম নর্ম্মান্ নৃপতির প্রপৌত্র ফরাসীদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে রাণীর নাম ইলিনর। সাধারণতঃ লোকের ধারণা, তিনি স্নেহহীনা, লঘুচেতা, প্রমোদপরায়না রমণী ; তিনি স্বামীর বিপক্ষে আপনার পুত্রগণকে উত্তেজিত করিয়া দেশে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন ; তিনি স্বামীর প্রণয়িণী রোজামণ্ডের মৃত্যুর কারণ। রাণীর চরিত্রে অযথা এইরূপ অনেক-গুলি দোষের আরোপ করা হইয়াছে।

সত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার চরিত্রে দোষগুণ উভয়ই ছিল। ফরাসীদেশের নীলসিন্ধু-বিধৌত রবি-করোজ্জ্বল পশ্চিমাংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার কৈশোর এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্রোতের মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল। তাঁহার কখনও আপনার প্রবৃত্তি-দমনের ইচ্ছা বা প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তিনি যখন ইংলণ্ডে আসিলেন, তখন তাঁহার চরিত্রে প্রীতিকর গুণগুলির কিছুই দেখা যায় নাই। তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট দোষ ছিল। ইলিনরের ন্যায় তেজস্বিনী রমণীর পক্ষে তাহা ক্ষমা করা সম্ভবপর হয় নাই।

রোজামণ্ডের মৃত্যুর ব্যাপারে ইলিনর নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায়, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডবাসিনী এক মহিলার পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুত হ'ন। এই রমণী রোজামণ্ড। বিবাহ না হইলেও

তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন। যখন রাজপুত্রগণ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলেন, ইলিনর তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে স্বামী তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। সেই সময় রোজামণ্ডের মৃত্যু হয়। সুতরাং লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, ইলিনরই রোজামণ্ডের মৃত্যুর কারণ। *

শেষ বয়সে দুঃখের মধ্যে যখন ইলিনর কঠোর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তখন যৌবনের অদম্য ভাব চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র রাজা হ'ন; কারণ প্রথম পুত্র দুইটি পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। এই পুত্রের রাজত্ব-কালে যাহাতে দেশে রাজক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যাহাতে বিরোধভাব না থাকে, তজ্জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল।

সে সময় ফরাসী-দেশের উত্তরপশ্চিম ভাগ ইংলণ্ডের অধীন ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের রাজত্বকালে সেই অংশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কেবল ইলিনরের সুশাসনের ফলে ইলিনরের পৈতৃক রাজ্যখণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত হইল না। বিদ্রোহিগণ ইলিনরের দুর্গ অবরুদ্ধ করিল। তাহাদের মধ্যে ইলিনরের এক বালক পৌত্র ছিল। বিদ্রোহী সামন্তগণের উদ্দেশ্য এই বালককে রাজা করা। মাতার বিপদের সংবাদ পাইয়া ইংলণ্ডরাজ তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করেন। ইলিনর স্বভাবতঃ প্রতিহিংসা-পরায়ণা ছিলেন না। তিনি বালকের জীবন রক্ষার জন্য পুত্রকে বার বার অনুরোধ করেন। পুত্র গোপনে তাহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। † কেহ কেহ বলেন, পুত্রের নিষ্ঠুরতা- ও নীচতা-দর্শনে ইলিনর অন্তরে দারুণ আঘাত পাইয়া কিছুদিন পরে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ডরাজ মাতৃরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; তাহা শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। ইলিনরের শাসন-ক্ষমতা কতদূর ছিল, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে।

ইলিনরের প্রপৌত্র প্রথম এডোয়ার্ড যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারও নাম ইলিনর। তবে এই ইলিনর স্পেন-দেশ-দুহিতা। পিতার জীবদ্দশায় এডোয়ার্ড বিদেশে বহুদূরে যুদ্ধ করিতে যান। তাঁহার পত্নী ইলিনর আপনার সন্তানগণকে ইংলণ্ডে রাখিয়া স্বামীর অনুগমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনেকে বুঝাইলেন; কেহ বা বিপৎসঙ্কুল শত্রুর দেশে প্রাণহানির যে আশঙ্কা আছে, সে-কথার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু উত্তরে সাধ্বী বলিলেন যে, বিধির বিধানে যাঁহাদের মিলন হইয়াছে কিছুতেই যেন তাঁহাদের বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত না হয় এবং ইংলণ্ড

* রোজামণ্ডের সম্বন্ধে অনেক ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের স্যামুয়েল ড্যানিয়েল-নামক কবি 'কম্প্লেন্ট অব রোজামণ্ড' (রোজমণ্ডের অভিযোগ-কাহিনী)-নামক কবিতায় মৃত্যুপুরীগতা রোজামণ্ডের মুখ দিয়া তাঁহার নিজ দুঃখময় কাহিনী বলাইয়াছেন। ওয়াল্টার-স্কট প্রণীত 'উড্ষ্টক'-নামক উপন্যাসে রোজামণ্ডের গুপ্ত আবাস-গৃহের উল্লেখ আছে। কবি টেনিসনের 'বেকেট'-নামক নাটকে রোজামণ্ড একটি চরিত্র।

† শেক্সপিয়ারের 'কিং জন' (রাজা জন্) নামক নাটকে বালকের করুণ মৃত্যু-কাহিনী বর্ণিত আছে।

ব্যাপের হইতে স্বর্গের পথ যত নিকটে, দূর বিদেশ হইতেও তাহা ঠিক্ সেইরূপ নিকটে। এরূপ উক্তয়ের প্রতিবাদ চলে না। ইলিনর স্বামীর সহিত ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া গেলেন।

যুদ্ধ-স্থানে এডোয়ার্ডের এক বিষম বিপদ্ উপস্থিত হয়। এক গুপ্ত ঘাতক বিষাক্ত ছুরিকা-দ্বারা তাঁহার শরীরে আঘাত করে। তাঁহার স্ত্রী ক্ষত-মুখে ওষ্ঠ-স্থাপন করিয়া বিষ টানিয়া ফেলিয়া দেন।* ইহাতেই রাজপুত্র সুস্থ হ'ন। আর যে নারী সাবিত্রী ন্যায় অসীম সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া পতিকে মৃত্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তাঁহারও কোন বিপদ্ ঘটে নাই।

এডোয়ার্ড রাজা হইলে পর ইলিনর ইংলণ্ডবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এডোয়ার্ডের জননী বিদেশিনী ছিলেন বলিয়া প্রজাগণ অসন্তুষ্ট ছিল; এমন কি তাহারা তাঁহার প্রতি অসম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ইলিনর বিদেশিনী হইয়াও যে তাহাদের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার গুণের পরিচয় দিতেছে।

বহুবৎসর পরে যখন ইলিনরের মৃত্যু হয়, তখন এডোয়ার্ড উত্তরে অভিযান করিতেছিলেন। স্কটলণ্ড-জয় স্থগিত রাখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আদেশে রাণীর মৃত-দেহ রাজধানীতে আনীত হয়।

যে যে স্থানে বাহকের দল শবাধার লইয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তথায় পুণ্য-শ্লোকা রাজ-মহিষীর পুত-স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে একটি সুদৃশ্য পবিত্র ক্রুশ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল।* সেগুলি বাহ্য সৌন্দর্য্যে মর্ম্মর-গঠিত 'দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-রূপিণী তাজমহল অপেক্ষা হীন হইলেও শোকের আন্তরিকতা ও পুঞ্জীকৃত বেদনায় গভীরতায় আগ্রার সমাধি-মন্দিরের সমকক্ষ।

প্রথম এডোয়ার্ডের পর ইঁহার পুত্র রাজা হ'ন। পিতা এডোয়ার্ড তদ্গতচিত্তা পত্নীর সেবায় প্রাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র স্বকীয় পত্নীর পরোক্ষ সাহায্যে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন্।†

প্রথম এডোয়ার্ডের পৌত্র তৃতীয় এডোয়ার্ডের পত্নীর নাম ফিলিপা। যখন এডোয়ার্ড ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যান, ফিলিপা ইংলণ্ডে থাকিয়া শিশু-পুত্রের নামে শাসন-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, স্বামী শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া দুর্ভেদ্য 'ক্যালে'-বন্দর অবরোধ করিয়াছেন, তখন তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট আসিলেন। নগরবাসিগণ অনেক দিন নগর রক্ষা করিয়া অবশেষে আহার্য্য-অভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিল। বহু অর্থ ও কাল-ক্ষয় হইয়াছিল বলিয়া এডোয়ার্ড অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যদি ছয় জন প্রধান নাগরিক মলিন-

---

* একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক কিন্তু রাণীর রাজপুত্রের প্রাণ-রক্ষা করার কথার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে অস্ত্রোপচারের দ্বারা রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা হয়। ইলিনর অস্ত্রোপচারের সময় স্বামীর যন্ত্রণা দেখিয়া এই ভাবে রোদন করিতে থাকিলে পার্শ্বস্থ আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যান।

* ওয়াল্থাম, নর্থাম্পটন্ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ক্রুশচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল। লণ্ডনের বিখ্যাত চেয়ারিং ক্রশও বোধ হয়, এডোয়ার্ডের 'প্রিয়তমা মহিষীর' স্মৃতি বহন করিতেছে।

† ইংরাজ নাটককার মার্লোর দ্বিতীয় এডোয়ার্ড-নামক নাটকে ইঁহার বর্ণনা আছে।

বেশে গলায় রজ্জু বাঁধিয়া দুর্গদ্বারের চাবি লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে তিনি সেই ছয়জনকে আপনার ইচ্ছা-মত দণ্ড দিবেন কিন্তু নগর ধ্বংস করিবেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্যালের অধিবাসিগণ এই কঠিন সর্ত্তে স্বীকৃত হইল। নগরের ছয়জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ইংরাজ-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহাদের প্রাণ-রক্ষার জন্ত বহু অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাজার মত টলিল না। অবশেষে রাণী ফিলিপা নতজানু হইয়া সিংহাসন-সমীপে উপবেশন করিলেন এবং করুণ বচনে বন্দি-কয়জনের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা একবার বলিলেন, "রাণী! তুমি এখানে উপস্থিত না থাকিলেই ভাল হইত।" পরক্ষণেই তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

রাণী সানন্দে তাঁহাদিগকে আপন শিবিরে লইয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে নূতন বেশ-ভূষায় ভূষিত করিয়া পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। ইহাতে ফিলিপা কেবল নারীসুলভ কোমলতার পরিচয় দেন নাই, তিনি কয়েকটী উন্নতচেতা নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদান করিলেন এবং স্বামীকে একটি ঘৃণিত মহাপাতক হইতে রক্ষা করিলেন।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের বহুদিনের সুলেখক কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত আর ইহলোকে নাই। প্রায় আড়াই মাস কাল জ্বর ভোগ করিতে করিতে বিগত ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১২ই মার্চ্চ) রবিবার রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার দুঃখিনী বিধবা জননী, পত্নী ও একটিমাত্র চারিবৎসর-বয়স্কা শিশু কন্যাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মাত্র ৩৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পকাল-মধ্যে স্বকীয় কবিত্ব ও প্রতিভাবলে তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘায়ু ব্যক্তির ভাগ্যেও কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ভগবদ্‌-ভক্তিপূর্ণ সরস কবিতাগুলির দ্বারা তিনি সাধারণের চিত্তকে বড়ই বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কবিতাতেই ভগবানে একাগ্র বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগতে যিনি মানবের চিত্তকে পরমার্থের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাঁহার জীবনই সার্থক। জীবেন্দ্রকুমার তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনতটিনীর মধুময় প্রবাহের দ্বারা এই সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। শিশুদিগের চিত্ত-কোরকটি সযত্নে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য তিনি সুনীতি-বিকাশ (১ম ও ২য় ভাগ) প্রহ্লাদ-উপাখ্যান, নির্ম্মাল্য, অঞ্জলি ও ধ্যানলোক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে এই সকল পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহার ধ্যানলোকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, "জীবেন্দ্রকুমার বাগ্দেবীর একনিষ্ঠ সাধক। তিনি চট্টগ্রামের নিভৃত 'সাধনা কুঞ্জে' বসিয়া 'চিরদিনবাসী' বীণাপাণির সাধনা করিতেছেন। এরূপ সাধনায় তাঁহার সফলতা নিশ্চিত।"

কবিত্ব-শক্তির প্রেরণায় সরিৎ-সাগর-ভূধর-

শোভিতা চট্টলা-জননী কবির জন্মভূমি। তাঁহার ভাষায় 'কোমলে ভীষণে, করুণে কঠোরে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বাংশে অতুলনীয়! এজন্য এ দেশ ভক্ত, প্রেমিক ও কবির বড়ই প্রিয়!' ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী 'শিশির'-'মাধবী'-রচয়িত্রী স্বর্গীয়া হেমন্তবালার কবিতা-মাধুর্য্যের সহিত বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকা সুপরিচিত। কবিবর নবীন চন্দ্র সেন ইঁহার পরম স্নেহশীল আত্মীয়। জীবেন্দ্রকুমার তাঁহার 'তপোবন'-নামক গীতিকাব্যখানি ইঁহারই অমর স্মৃতিতে উৎসর্গ করিয়াছেন। কবির পিতৃদেবও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পিতার এই কবিত্বশক্তি পুত্র-কন্যাতে সমধিক বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

জীবেন্দ্রকুমার সাহিত্যচর্চ্চাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন; ইহাতে লাভ-ক্ষতির বিচার করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ তাঁহাকে অন্যতম সহায়ক সদস্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া সহায়বান্ হইয়াছিলেন। বহু মাসিক পত্রে প্রায় নিয়মিত-ভাবে তিনি তাঁহার কবিতা প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার প্রেরিত কয়েকটি কবিতা এখনও আমাদের নিকটে রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি গান অদ্য এই স্থানে মুদ্রিত করিতেছি। বিশ্বের কবি বিধাতা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন্ এবং তাঁহাকে অপার সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া ধ্যানলোকে স্থান-দান করুন্।—

গান।

দুঃখ আমায় যতই দেবে দয়াল তুমি বারে বারে,
হত্যা দিয়ে থাক্‌ব পড়ে তোমার ওই সিংহদ্বারে!

আশায় যত নিরাশ হব,
মুখের পানে চেয়েই রব,
প্রাণের ব্যথা তোমায় কব
সিক্ত হয়ে নেত্রাসারে!

রুদ্র তুমি যতই হবে,
আশ্রয়-শেষ কেড়ে লবে,
ডাক্‌ব তত আকুল রবে
তোমায় মম মর্ম্মাগারে!

আমার তুমি তোমার আমি,
জেনেছি সার জীবনস্বামী,
তাই যে শুধু দিবস-যামী
আছি তোমার পথের ধারে!

পিষ্ট যদি হতেই হয়,
নাই ভাবনা, নাইক ভয়,
ও চরণে দলা হৃদয়
যতই খুসী এ সংসারে॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সংবাদ।

১। ব্রহ্মদেশে জননী- ও শিশু-মৃত্যুসংখ্যা অত্যধিক হইতেছে। প্রতিবৎসর অন্ততঃ পনের দশ সহস্র জননী অল্পপরিমাণ ও সামরিক ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থার অভাবে অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন। শিশুদিগের মধ্যেও প্রতিসহস্রে তিন শত হইতে চারিশত

জন তাহাদের জীবনের প্রথম বর্ষেই প্রাণত্যাগ করে। রোগীর কিরূপ চিকিৎসাদির প্রয়োজন এই সামান্ত জ্ঞানের অভাবেই যে এইরূপ ঘটে তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ধাত্রী ও সেবিকাগণের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া এই অভাব দূরীকরণার্থ প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে।

২। কুমারী আইভি উইলিয়াম্‌স্‌ আগামী ১০ই মে ইংলণ্ডের আদালতে ব্যারিষ্টাররূপে গৃহীত হইবেন। ইংলণ্ডে ইনিই প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার।

৩। এসিয়া-মাইনরে প্রায় সার্দ্ধচারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে তখন স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। দুইজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের হস্তে নগরীর শাসনভার অর্পিত ছিল। পুরুষ-দুইজনের মধ্যে একজন রাজপদ-বাচ্য এবং অপরটি নগরাধ্যক্ষ। স্ত্রীলোক-দুইটিও যথাক্রমে ঐরূপ পদে আসীন ছিলেন এবং তাঁহাদের অধিকার-ক্ষমতাও পুরুষ-দ্বয়ের তুল্য ছিল। ইষ্টকে লিখিত লিপি ও হুণ্ডীও পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ লিপি-পত্রাদি বিতরণ করিবারও যে ব্যবস্থা ছিল, তাঁহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

৪। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দুইটি অংশ। একাংশের নাম 'হাউস্‌ অফ্‌ কমন্স্‌' এবং অপরাংশের নাম হাউস্‌ অফ্‌ লর্ডস্‌। দেশবাসিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই হাউস্‌ অফ্‌ কমন্সের সভ্য হ'ন। লর্ড-উপাধিধারী সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণ অথবা উত্তরাধিকার-সূত্রে তদুপাধিধারী বংশধর পুরুষ হাউস্‌ অফ্‌ লর্ডসের সভ্য। রাজা ইচ্ছা করিলে কোন ব্যক্তিকে উপাধি-দান করিয়া এই সভার সভ্য করিতে পারেন। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন প্রথা এ-স্থানে নাই। তবে স্কট্‌লেণ্ডের লর্ড-উপাধিধারী সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ইহার সভ্য হইবার অধিকার পান না; তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রতিনিধিস্বরূপ ইহাতে প্রেরণ করা হয় মাত্র।

অনতিকালপূর্ব্বে মহিলাগণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া হাউস্‌ অফ্‌ কমন্সে প্রবেশ-লাভ করিয়াছেন। পরন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে ইতঃপূর্ব্বে হাউস্‌ অফ্‌ লর্ডসে কোন রমণী প্রবেশাধিকার পান নাই। সম্প্রতি Viscountess Rhondda নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হাউস্‌ অফ্‌ লর্ডসে নিজাধিকারে সভ্যরূপে বসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভ্য হইবার এই অধিকার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নৃপতির পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠে নাই। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে আরও বিংশতি সম্ভ্রান্ত রমণী উক্ত সভায় সভ্যরূপে প্রবেশ করিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের অধিকার পাইয়াছেন। স্কটলণ্ড হইতে এখন এইরূপ চারিজন রমণী প্রতিনিধি-রূপের নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতে পারিবেন।

৫। ইংলণ্ডে যেমন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা, জার্ম্মানিতে সেইরূপ রিক্‌ষ্টাগ্‌ সভা আছে। শ্রীমতী ক্লাউজিজ্‌, ইহার বিখ্যাত স্ত্রী-সভ্যা। সংরক্ষণ-নীতির পোষক এক সভ্যের বক্তৃতায় বাধা দিবার সময় তিনি মূর্চ্ছিতা হ'ন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

৬। আগামী ১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল ১৯২২) রবিবার, হাবড়া সহরে বেদ-সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সম্মিলন হইবে। বঙ্গের বরেণ্য মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সি-এস্-আই, সি-আই-ই, এম-এ, ডি-এল্, সরস্বতী, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন। যাহারা এই সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সংস্কৃত, ইংরাজী বা বাঙ্গলা, যে কোন ভাষায় বেদবিষয়ে যে কোন প্রকার গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া আগামী ১৪ই বৈশাখের মধ্যে সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট, পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়, হাবড়া, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। **মহিলাগণের রচনাও ইহাতে পরিগৃহীত হইবে।** সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণও আহূত হইবেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিত মাত্রেরই এই সম্মিলনে উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। (২—৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বর্ণ-পদক—(ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। (৩) হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব। (৫) শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন। (৬) রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা। (৭—৮) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান। (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র। (৯) নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "ভরৎকাক"-চরিত্র। (১০) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র। (১১) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যান-সমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা। (১২) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ২য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৩য় বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৮ম ও ৯ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ৩০এ বৈশাখ ১৩২৯ মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় প্রবন্ধগুলি পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

July, 1922. Reg. No. C. 134.

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আষাঢ়, ১৩২৯—জুলাই, ১৯২২।

সূচী

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারিআনা) মাত্র।

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে"

যেমন আজকাল চলতি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়ার্কিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চলতি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা"

তিন অক্টেভ,	দু'সেট রীড	...	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	...	৬০৲ টাকা

"ডোয়ার্কিন ফ্লুট"

তিন অক্টেভ,	দু'সেট অর্গান রীড	...	৭৫৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড	...	৯০৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড—এক সেট উদারা		১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

"গ্রামোলা"

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্,
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

"ডোয়ার্কিন ফ্লুট"

টেলিগ্রাম: "মিউজিকাল্"

টেলিফোন: ১০৫১ কলিকাতা

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১২শ কল্প—৩য় ভাগ।

১৩২৯ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

মাদকতা আমাকে গ্রাস করিয়াছিল। মনে তামসিক ভাবের পূর্ণ রাজত্ব ; তথায় অহঙ্কার স্পর্দ্ধা নিষ্ঠুরতা সদর্পে বিরাজ করিতেছিল। বিজয়নগরে ফিরিবার পথে মনে সঙ্কল্প করিলাম সে হার হেমকে দিতে হইবে।

"রাজধানী প্রবেশের পথে পিতার দর্শনলাভ হইল। আমার মুখে যুদ্ধের বর্ণনা শুনিয়া মনে হইল তিনি প্রীত হইয়াছেন। দণ্ডনায়কের প্রাসাদে উপনীত হইয়া শুনিলাম হেম আনিগণ্ডীতে। আনিগণ্ডীতে উপস্থিত হইলাম। তন্নু আমার বিজয়লাভে হর্ষপ্রকাশ করিল, কিন্তু আমি যখন আমার আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলাম তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল।"

নাগরাও বলিলেন, "দেবল! ক্ষান্ত হও, অতীতকে আর জাগাইয়া তুলিওনা। প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আমার অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে!" দেবরায় এবার কথা কহিলেন না। দেবলের কাহিনীর অবশিষ্টাংশ শুনিবার জন্য তাঁহার অন্তরে প্রবল ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। তিনি নাগরাওয়ের উক্তির কোনরূপ সমর্থন না করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত তাম্বুলাধার হস্তে হইয়া নীরবে ক্রীড়া করিতেছিলেন। মধুরাও বলিলেন, "দণ্ডনায়ক নাগরাও! তুমি এখন ভুলিয়া যাও তন্নু তোমার ভ্রাতা, হেম তোমার ভগ্নী।" নাগরাও বলিলেন, "আপনি দেবলের সমস্ত কথা বিশ্বাস করেন?"

নাগরাও যে স্থান হইতে কথা কহিতে ছিলেন, দেবল সহসা সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নির্ব্বাপিত অক্ষি-কোটর হইতে বিদ্যুৎ-শিখা বহির্গত হইল না বটে, কিন্তু দেহ উত্যক্ত ঋক্ষের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মধুরাও বলিলেন, দেবল! নাগরাওয়ের বাক্যে কর্ণপাত করার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার কথা সর্ব্বাংশে বিশ্বাস করি। তোমার পিতা এখানে থাকিলে তিনিও বিশ্বাস করিতেন। তিনি যখন এখানে আসিবেন, আমি তাঁহার সমস্ত ভ্রম উৎপাটিত করিয়া দিব। বল, দেবল কি বলিতেছিলে?"

দেবল ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি আর আসিবেন না। তিনি নাই।" দেবরায়ের হস্ত হইতে তাম্বুলাধারস শব্দে গৃহতলে নিপতিত হইল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "দেবল!" মধুরাও দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া বলিলেন, "মারাপ্পার পুত্র! এ কথা কি সত্য?"

দেবল রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সত্য!" তখন নাগরাও পিতার অঙ্গাবরণের কণ্ঠবন্ধনী শিথিল করিয়া দিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

দয়া।

শীতান্তে বসন্তে যথা
  মলয়ের নিরমল স্নিগ্ধ সমীরণ,
ক্লান্তিভরা ক্ষুব্ধ প্রাণে
  এনে দেয় কোথা হ'তে মহা-জাগরণ,
তেমতি বিভূর দয়া
  মৃত-কল্প আশাহীন জীবনের মাঝে,
অমৃতের ধারা দিয়ে
  পূর্ণ করে অপূর্ণেরে নবীনের সাজে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

নিবেদন।

স্বর্গগতা সহকারিণী সম্পাদিকা মহাশয়ার স্বর্গারোহণোপলক্ষে রচিত যে কয়টি কবিতা প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও কয়েকটি রচনা ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

———∘∘∘———

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 707. July, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।		১২শ কল্প।
৭০৭ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩২৯। জুলাই, ১৯২২।	৩য় ভাগ।

বরষায়।

এস ঘন-শীতল এলায়িত-কুন্তল
শ্যাম-বরষা!
তব স্নেহ বিনা হায় বসুধা মূরছি' পায়
মরণ-দশা!
গ্রীষ্মদাহন-গর
পীযূষে বিনাশ কর,
বিহ্বল-চরাচর
কর সরসা!

স্নিগ্ধ সমীর আসি' বাজা'ল আশার বাঁশী,
কাজলে-মেঘে—
দিগন্ত এস ঢাকি' জুড়া'ক্ তাপিত আঁখি
মূরতি দেখে!
পরশি' শীকর-কণা
ফিরে যেন সুচেতনা,
ঢাল সুধা-সান্ত্বনা
প্রাণ-পরশা!

শ্রীসুধেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—০—

ইতিহাসে রমণী।

মেরীর পর তাঁহার বৈমাত্র ভগিনী এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা অষ্টম হেনরীর সময়ে ইংলণ্ডে যে সংস্কৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এলিজাবেথ তাহারই পক্ষপাতিনী। তিনি রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু যখন রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা এলিজাবেথের বিরুদ্ধাচরণ

করিতে লাগিল, তখন ক্রমে ক্রমে ঘঠনা-চক্রের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে কঠোর হইতে হইয়াছিল।

ইউরোপে তখন স্পেনের প্রবল প্রতাপ। স্পেন রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আপনার সাম্রাজ্যে সংস্কৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের উপর অত্যাচার করিতেছিল। এলিজাবেথ শান্তির পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাঁহারই বুদ্ধি-কৌশলে বহুদিন স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু বাহ্যতঃ স্পেনের সহিত বিবাদ না বাধিলেও অধিকাংশ ইংলণ্ড-বাসীর চিত্তে স্পেনের প্রতি বিরুদ্ধভাব বদ্ধমূল হইতেছিল। স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশ-সমূহ হইতে যে ধনরত্নপূর্ণ জাহাজগুলি আসিত, ইংরাজ নাবিকগণ মধ্যপথে তাহা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ লুণ্ঠনকারিগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার উপর স্পেন-রাজ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া এলিজাবেথকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন সেই নাবিককে স্পেনের হস্তে সমর্পণ করেন। এলিজাবেথ তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া নাবিক-প্রধানকে সম্মানে ভূষিত করিলেন। তিনি লুণ্ঠিত ধনরত্নের মধ্য হইতে যে কয়েকটি রত্ন রাণীকে উপহার দিয়াছিলেন, রাণী তাহা মুকুটে স্থাপন করিয়া প্রকাশ্যে পরিধান করিলেন। অভিযোগ নিষ্ফল দেখিয়া স্পেনীয় রাজদূত রাণীকে ভয় প্রদর্শন করিলেন যে ইহাতে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। এলিজাবেথ ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া স্বাভাবিক স্বরে দূতকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি যদি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে রাণী তাঁহাকে কারাগারে নিঃক্ষেপ করিবেন।

স্কট্‌লণ্ড-রাণী মেরী* বহুদিন ইংলণ্ডে বন্দিনী হইয়াছিলেন। তিনি রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যখন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এলিজাবেথের আদেশে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইল, অন্যান্য রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের নেতৃগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন; ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্কট্‌লণ্ড-রাণীর অধিকার ছিল; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অধিকার স্পেন্‌রাজকে সমর্পণ করিয়া যান। স্পেনরাজ বুঝিলেন ইংলণ্ডকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি সেইজন্য আপনার বিশাল নৌ-বাহিনী একত্র করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

ইংলণ্ড এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। রাণীর পরামর্শ-দাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে রাজ্যের প্রধান রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া তাঁহাদের প্রাণনাশ করা হউক; কারণ, যুদ্ধ হইবে ঐ ধর্ম্মাবলম্বী প্রধান রাজার সহিত। এলিজাবেথ এ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। রাজ্যের কয়েক জন প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজা অসন্তোষের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া তিনি সেই ধর্ম্মাচরণকারী সমুদয় প্রজাকে দেশদ্রোহী ভাবিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, মাতা যেমন আপন সন্তানগণের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করিতে পারেন না, তিনিও সেইরূপ আপন প্রজার সম্বন্ধে কোন হীন ধারণা রাখিতে পারেন না। রাণীর এই বিশ্বাস অপাত্রে স্থাপিত হয় নাই। সেই বিপৎকালে রাজ্যের অধিকাংশ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ অবিচলিত দেশ-ভক্তির পরিচয়

---

* ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যায় স্কট্‌লণ্ড-রাণী মেরীর ইতিহাস বর্ণিত আছে। লেঃ

দিয়া দেশের মান-রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আপনারাও অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ড-বাসিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। উপযুক্ত নাবিকগণের অধীনে যুদ্ধ-জাহাজগুলি রক্ষিত হইল। পাছে স্পেনীয় সৈন্য রণতরী হইতে অবতরণ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করে সেইজন্য দেশের নানাস্থান হইতে সৈন্যদল একত্র হইতে লাগিল। রাণী স্বয়ং যোদ্ধবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীর সন্নিকটে একস্থানে সমবেত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। যুদ্ধে স্পেনের বিশাল নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইল। ইংরাজ-রণতরী-সমূহ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না; কারণ, তাহাদিগের গোলাগুলি ফুরাইয়া গিয়াছিল। তথাপি শত্রুর পরাজিত নৌ-বহর রক্ষা পাইল না। প্রবল ঝটিকায় তাহাদিগের অধিকাংশ জলমগ্ন হইল এবং অতিশয় অল্প-সংখ্যক পোতই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা-প্রভাতে।

[রচনা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী]

আজিকে প্রভাত আসিল কাহার
ব্যথার বারতা বহি!
গোপন কাহার আঁখিজলধার
ঝরে' পড়ে রহি' রহি'!

নীরব নিঝুম, নিদ্রিত পুরী,
আঁধারে আলোয় চলে লুকোচুরি,
সিক্ত বাতাস মরে শুধু ঘুরি
মর্ম্ম-বেদনা-কহি'!
নীরব উষায় নয়ন-আসার
ঝরে শুধু রহি' রহি'!

আজি এ প্রভাতে আকাশ, বাতাস,
জল-ভরা আলো ছায়া;
ঘুম-ভাঙ্গা ছুটি চোখের সম্মুখে
রহিয়াছে কোন্ মায়া!

আজি অকারণ কাহার লাগিয়া
বিকল সহসা আমার এ হিয়া,—
সারাটি সকাল মরে গুমরিয়া
কোন্ বেদনায় দহি'!
বাহিরে কেবল ঝর ঝর জল
ঝরিতেছে রহি' রহি'!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মধুমাধবী—একতালা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´

II { মরা মপা মরা । ন্া সা -ন্সরা I ন্া রসা ন্সরা ।

আ০ জি০ কে০ প্র ভা ০০ত্ আ সি০ ক০৫

৩ ০ ১

। ন্সা সরা -া । রা মা -পপা । মরা মা রা I

কা০ হা০ র্ বা থা ০র্ বা০ র তা

২´ ৩ ০

I রা -মপা -মপা । পা -মা -পা । রা মপা পা ।

ব ০০ ০০ হি ০ ০ গো প০ ন

১ ২´ ৩

। ণপা পমা -পা I মা পমা পনর্র্া । র্রা নর্সা -া ।

কা০ হা০ র্ আঁ খি০ জ০০ ল ধা০ র্

০ ১ ২

। না পা রমা । মা পমা রা I া ন্সা -রা ।

ক রে প০ ড়ে র০ হি ০ র০ ০

৩

। সা -ন্া -সা } II

হি ০ ০

অন্তরা।

০ ১ ২´

II { মা পা মা । না পা -মা I মপা নর্সা র্রা ।

নী র ব নি ঝু ম্ নিদ্ দ্রি ত

৩ ০ ১

। ননা র্সা -া । র্রা র্সা না । র্রা নর্সা -া I

পু০ রী ০ আঁ ধা রে আ লো০ র